প্রথম প্রকাশ
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ বেরা
বাণীশিল্প
১১৩ই কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

মুদ্রক
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০০০৮

প্রচ্ছদ
প্রণবেশ মাইতি

মাকে

পূর্বসূত্র

অন্-আর্য ॥

আর্যভাষী মানুষরা আসার আগে থেকে এঁরা এদেশে ছিলেন। এঁদের নিজস্ব একটি সাংস্কৃতিক বিন্যাস আছে। স্থানীয় শিল্পকলা এই পারিপাট্যের উপর বোনা।

অনুবাদ ॥

শব্দানুবাদ নয়, ভাবানুবাদ কবিতার ধারাকে পুষ্ট করে। শব্দ প্রসঙ্গ থেকে অর্থ পায়। প্রাসঙ্গিক আনুষঙ্গিক অর্থবহ সব শব্দ ব্যাকরণের নিয়ম ও গঠনগত সম্পর্ক মেনে ভাবকে কবিতায় রূপ দেয়। অনুবাদে বাক্ ও অর্থ পরস্পর সংপৃক্ত। অনুবাদে যুগরুচি প্রাধান্য চায়।

অফসেট প্রিন্টিং ॥

পুরোনো লেটার প্রেস প্রিন্টিঙের বদলে এ শতকে ফোটো অফসেট ছাপার রীতি জনপ্রিয়। আলোকচিত্রের সহায়তায় এখানে রাবারের উপর প্রতিলিপি ওঠানো হয়। বাংলা ছাপায় এ প্রণালী নতুন যুগ এনেছে।

অলংকার ॥

কবিতায় সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য শব্দ ও ভাবের রূপবান্ প্রকাশ। কথার অলংকার ও ভাবের অলংকার আলাদা ভাবা হয়ে থাকে। কবিতায় অলংকার প্রয়োগের নিজস্ব ও আলাদা মূল্য আছে সামান্যই, কারণ কবিতার আবেদন সামগ্রিক। ভারতের সাহিত্যতত্ত্বকে সাধারণভাবে অলংকারশাস্ত্র বলা হতো। অলংকার কবিতা নয়, কবিতাই অলংকার।

অবক্ষয় ॥

এক ধরনের ছন্দ-পতন। আগেকার কাব্যগত উৎকর্ষ থেকে ক্রমে নিচে নেমে আসা। ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের সঙ্গে এর যোগ।

অভিসার ॥

সংস্কৃত সাহিত্যের নায়কনায়িকাদের থেকে অভিসরণের ধারণা এসেছে। মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় অভিসার বা প্রেমিক প্রেমিকার মিলন ব্যাপারটি একটি আবৃত্ত প্রসঙ্গ। প্রেমিকার লজ্জা থাকলে অভিসার হয় না।

অমিত্রাক্ষর ॥

পয়ারের পর উল্লেখ করার মতো বাংলা ছন্দের বিশিষ্ট রীতি। এ একধরনের মিলবিহীন প্রবহমান পয়ারের রীতি। উনিশ শতকে মধুসূদন থেকে শুরু ক'রে দীর্ঘকবিতা ও নাটকে এর ব্যবহার হতে থাকে। লৌকিক বাক্‌রীতিব উপর অমিত্রাক্ষর নির্ভরশীল।

অধিবাস্তবতা ॥

সার্‌-রিয়েলিজমের বাংলা। বাস্তবতাকে বিশ্বাস্য ক'রে তোলার জন্য বাস্তবকে অতিক্রম করা দরকার এই মত। এ নিয়ে আন্দোলন হওয়ার আগেও এ জিনিশ সাহিত্যে ছিল। রোমান্টিক পলায়নবৃত্তির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ। ইন্দ্রিয়েব মাধ্যমে ব্যক্তি ও বিশ্বকে জানাব এ একটি উপায়। ছবি, চলচ্চিত্র, ভাস্কয এসবেও এর প্রভাব আছে।

আগমনী ॥

পিত্রালয়ে বধূ দুর্গার আগমনসূচক সুন্দর সকরুণ গান। শাক্ত গান হলেও এর প্রধান মূল্য মানবিক। বিজয়া গান-এর পরিপূরক। দক্ষিণ ভারতের মতো শৈব-সাহিত্যের বিস্তৃত ঐতিহ্য বাংলায় নেই। আগমনী বিজয়া গান সে শূন্য কিছুটা ভরাট করেছে।

আর্কিটাইপ ॥

প্রতীক বা চিত্রকল্প রূপে কবিতায় এমনভাবে আর্কিটাইপ ফিরে ফিরে আসে যে সামগ্রিক সারস্বত অভিজ্ঞতার একটি উপাদান হিশেবে তা চেনা যায়।

আঙ্গিক ॥

কবিতা যা তা আঙ্গিক নয়, কবিতা যেভাবে লেখা হয় তা-ই আঙ্গিক। কবিতার ভাব ও রূপ অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রতিস্পর্ধী না, পরিপূরক। কাব্যবস্তুকে যা আকার দেয় সাধারণভাবে সেটা আঙ্গিক। কবিতার ছন্দ, গদ্যরীতি,

রচনাশৈলী ব্যাপকবিচারে সব আঙ্গিকের মধ্যে এসে পড়ে। সমূহ কাব্যগত অভিজ্ঞতাকে সত্যতর পূর্ণতর নিবিড়তর ক'রে পাওয়াতে আঙ্গিকের তাৎপর্য বিধৃত।

ইসলামি প্রসঙ্গ ॥

তেরো থেকে উনিশ শতক পযন্ত হিন্দু কবি ও সংস্কৃত কাব্যবিষয়ের পাশাপাশি মুসলমান কবি এবং ইসলামি কাব্যপ্রসঙ্গ থেকে গেছে। বাঙালিদের একটি বড়ো অংশের কাছে এসব প্রসঙ্গ উপাদেয় ছিল। ইসলামি প্রসঙ্গ শুধু ইসলাম শাস্ত্র নিয়ে সম্পূর্ণ নয়। মধ্যযুগের বাংলা প্রণয়কাহিনীব অধিকাংশ এসেছে মুসলমান কবিদের কাছ থেকে। এসব কাব্যের বিষয় একদিকে ফারসী সাহিত্যের থেকে নেওয়া অন্যদিকে বাংলার লৌকিক জীবন থেকে সংগৃহীত।

উপভাষা ॥

কবিতায় উপভাষা ব্যবহারেরও সামাজিক মূল্য আছে। বাংলা কবিতায় উপভাষার বিশেষ অভিঘাত থেকে গিয়েছে। উপভাষার ব্যবহারের ফলে কবিতা পুরোনো মনে হতে পারে। কবিতায় উপভাষার আবেদন শ্রুতিগত। পুনরাবৃত্ত লোকসাহিত্যের সঙ্গে উপভাষার প্রধান যোগ। শ্রেণীভেদ যত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, কবিতার উপভাষা ততই নতুন মূল্য পায়।

উপমা ॥

একটি জিনিশের সঙ্গে আরেকটি জিনিশের তুলনা। অনেকসময় তুলনাবাচক শব্দও থাকে। উপমা বিবৃতিনির্ভর। ভাববিস্তারের দিকে এর ঝোঁক। এপিক কবিতায় এই সম্পর্কের তুলনা আরো দীর্ঘ ও জটিল হয়ে ওঠে। অন্য কবিরাও এ জাতীয় উপমা ব্যবহার করেন। রূপক তৈরির ব্যাপারে উপমার প্রভাব ক্রিয়াশীল।

উভযোজ্যতা ॥

অ্যামবিভালেন্স-এর বাংলা। দর্শন ও বিজ্ঞান থেকে এ পরিভাষা সাহিত্য সমালোচনায় এসেছে। এবং/অথবার যুগ্ম না হয় বিপ্রতীপ মূল্যবোধকে এ শব্দটি চিহ্নিত করে।

এপিক ॥

জনজীবনের বিশিষ্ট কোনো প্রসঙ্গনির্ভর কাহিনীমূলক মৌখিক বা লিখিত দীর্ঘকবিতা।

কীর্তন ॥

মহারাষ্ট্রের অভঙ্গ, পশ্চিমের ভজনের মতো কীর্তন বাংলার ভক্তিগীতি। প্রথমে বৈষ্ণব গান ও পরে শাক্ত গানও কীর্তন হয়ে ওঠে। এর মূল আরো পুরোনো। আগেকার যৌথ কীর্তনের চেয়ে একক কীর্তনের দিকে এখন এর প্রবণতা বেশি। অথচ গণ-যোগাযোগের মাধ্যম হিশেবেও এর ব্যবহার। নরোত্তম ঠাকুর একে বিশিষ্ট সংগীত রীতিতে পরিণত করেন, পরে বাংলা গানে তার উল্লেখযোগ্য ছাপ পড়েছে। রসিক দাস বাংলার সবচেয়ে ভালো কীর্তনিয়া।

কেচ্ছা ॥

মধ্যযুগের শেষের দিকে ইসলামি কাব্য বিষয় নিয়ে লেখা রোমান্টিক প্রণয়কাহিনীকে সাধারণভাবে কেচ্ছা বলা হতো। কিস্‌সার সঙ্গে কুৎসা জড়িয়ে গিয়ে শব্দটি এখন নিন্দিত।

কবিগান ॥

বাংলা কবিতার নাগরিক বিবর্তনের সাক্ষ্য। এ শহুরে মানুষদের লোক-সাহিত্য। আঠেরো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলায় এর চল ছিল। পুরাণপ্রসঙ্গের একঘেয়েমি, বৈষ্ণবগানের গতানুগতিকতা, কৃত্রিমতা, ইতরতা এসব থাকলেও কবিওয়ালাদের গান সাধারণের কথায় সাধারণের ভাব সহজে তুলে ধরার এক আশ্চর্য চেষ্টা।

ক্লিষ্ট শব্দ ॥

ক্লিশে-র বাংলা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতার কিছু বিশেষ পদবন্ধ কিছু বিশেষ তুলনা ক্রমে নিষ্প্রাণভাবে ব্যবহৃত হতে হতে ধার হারিয়ে ফেলে বাক্‌রীতির জরাজীর্ণ কিন্তু আবশ্যিক অংশ হয়ে যায়।

গীতিকা ॥

ব্যালাডের বাংলা। ব্যালাড হলো মৌখিকভাবে প্রচারিত লোকায়ত-কাহিনীমূলক সংহত সংরক্ত ক্ষিপ্রচালের নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গির গান।

গোপীযন্ত্র ॥

বৈষ্ণব আর বাউলদের নাচ আর গানের অনুষঙ্গী এক-তারের বাজনা। গাবগুবাগুব কথাটিও শোনা যায়।

গদ্যকবিতা ॥

বাংলা গদ্যকবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুক্ত কবিতা নয়। গদ্যকবিতার অনেক আগে ছন্দযতির হাত থেকে অর্থযতি মুক্তি পেয়েছে। কিছু কিছু গদ্যে কবিতা আছে, আর প্রায় সবই অনতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধনে ধরা পড়ে, স্বাধীন গদ্যকবিতা হয়ে ওঠে না।

ঘুমপাড়ানি গান ॥

এক ধরনের ছড়া, লোকসাহিত্যের একটি অঙ্গ। শিশুকে ঘিরে নির্যাতিত মায়েদের স্বপ্ন সাধ আকাঙ্ক্ষার আবিষ্ট স্নেহসিক্ত ক্ষেত্রে এর উদ্ভব। একে নার্সারি রাইমের মধ্যে ফেলা যায় না।

চর্যাগান ॥

শুধু নব্য ভারতের ভাষা সংগীত ধর্ম সমাজ দর্শনের প্রাচীন প্রমাণ নয়, এটি বাংলা কবিতারও প্রাচীনতম সংকলন। দশ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে এসব গান লেখা হয়েছে।

ছড়া ॥

একজাতীয় লোককবিতা। এর এক অংশ শিশুকেন্দ্রিক। ছড়ার একটি বিশেষ ছন্দ আছে। এই দ্রুতলয়কে বাঙালি ছান্দসিক স্বরবৃত্ত বা দলমাত্রিক রীতি বলেছেন। এর মূলে অন্-আর্য প্রভাব ক্রিয়াশীল। ছড়া লোকসাহিত্য, তবু কবি ব্যক্তিগতভাবেও অনেকসময় ছড়াদার।

জীবনীকাব্য ॥

চৈতন্যের পরে পরেই ভক্তরা তাঁকে নিয়ে সংস্কৃত ও বাংলায় চৈতন্যজীবনী লেখেন। এর মধ্যে চৈতন্যভাগবত আর চৈতন্যচরিতামৃত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের উপাদান, সমাজের তথ্য, বৈষ্ণবধর্ম ও দর্শনপ্রসঙ্গ এবং চৈতন্যের ব্যক্তিজীবন মিশে গিয়ে এখানে মানবরসের ক্ষরণ ঘটিয়েছে। বাংলায় সন্তজীবনীর চল হলো এভাবে।

টেরাকোটা ॥

পোড়ামাটির কাজ। নদীনির্ভর বাংলায় সহজলভ্য এবং সুলভ মাটির নমনীয়তার সুবিধা নিয়ে বাংলার লোকশিল্পীরা দীর্ঘদিন ধরে পোড়ামাটির কাজ করে আসছেন। চর্যাগানের সমসাময়িক পাহাড়পুরের টেরাকোটা বাংলার লোকশিল্পের একটি নতুন অধ্যায় শুরু করেছে। যে প্রাণ, শক্তি, গতি, সরলতা, নৈপুণ্য ও বহুমুখী চিত্রণে বাঙালির স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য চর্যাগান ও পাহাড়পুরের টেরাকোটায় তাই বিম্বিত।

টপ্পা ॥

টপ্পা গানের কথা বাংলায় বললে নিধুবাবুর কথা আসে। ছাপরায় থাকার অভিজ্ঞতা নিধুবাবুর কাজে লেগেছিল। হিন্দুস্থানী গানের আদর্শে প্রায়-লোকায়ত টপ্পার একটি বাংলা ঘরাণা সেই উনিশ শতকেই তৈরি করে ফেলেছিলেন। বাংলা প্রেমকবিতার বিবর্তনে নিধুবাবুর টপ্পার ভূমিকা একটুও উপেক্ষা করার মতো নয়।

নাটগীতি ॥

একই সঙ্গে নাটকীয় ও গীতি লক্ষণে আক্রান্ত সংলাপবদ্ধ আখ্যানকাব্যকে নাটগীতি বলা হতো। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুরোপুরি এক নাটগীতির নিদর্শন। বর্তমান কালে যাত্রাপালা অনেকটা নাটগীতির ছাঁচে ঢালা। নাটগীতি অপেরা নয়। মিস্ট্রি প্লে মির‍্যাকল্‌প্লের সঙ্গেও এর মিল কল্পিত।

নীতিকবিতা ॥

কাব্যরীতির বিবর্তনের একটি প্রাথমিক স্তর। একসময় শিক্ষা দেওয়ার জন্য তথ্য জানানোর জন্য নীতিকবিতার ভূমিকা ছিল। এদিক থেকে এর যোগ বৈজ্ঞানিক সচেতনতার সঙ্গে। আর অন্যদিকে নীতিকবিতা উচ্চবিত্তের আলস্যের সঞ্চয়।

নান্দনিক অভিজ্ঞতা ॥

সৌন্দর্যের নিজস্ব মূল্য সম্পর্কে সজাগ বোধ থেকে মূলত আসে। কবির ক্ষেত্রে এ অভিজ্ঞতা তাঁর আঙ্গিক সচেতনতার সঙ্গে প্রধানভাবে জড়িত।

পদাবলী ॥

পদ সংগ্রহ। বৈষ্ণবপদাবলীর মতো পালাবদ্ধ হলে এ ধরনের সংকলন অনেকটা খণ্ডকাব্যের রূপ পায়। পদাবলী কিছু ছোটো লিরিকের সমষ্টি। এর মধ্যে যে ধুয়ো থাকে তা বিশেষভাবে গাওয়া হয়। শেষে ভণিতায় অন্তত কবির নিজের নাম থাকে।

পট ॥

বাংলা লোকশিল্পের এক দিক পটে উন্মোচিত। যে পটে ছবি আঁকা হয় তা দীর্ঘ গুটোনো হতে পারে। পটের ছবি ও গান পরস্পর সহযোগী। পটের প্রসঙ্গ মূলত পুরাণ লোকবিশ্বাস এবং সামাজিক ঘটনা থেকেও নেওয়া। টেরাকোটার মতো পট এক মৃত শিল্প। আধুনিক চিত্রকলায় অবশ্য এর প্রভাব থেকে গিয়েছে।

পুথি ॥

উনিশ শতকের আগেকার বাংলা কবিতা ছাপাখানা ছিল না ব'লে লিখিত অবস্থায় পুথিতে ধরা থাকতো। এখনো অনেক কবিতা এ রকম পুথিবদ্ধ হয়ে আছে। পুথি ও পুথির প্রসঙ্গ বাঙালির কাছে দুইই ধর্মীয় অনুষঙ্গ জাগাতো। তেরো শতকেব কাছাকাছি সময় অনেক বাঙালি পুথি নেপাল তিব্বতে চলে যায়। পুথির পাটার ছবির উপর নির্ভর ক'রে বাংলা ছবির প্রাচীন রীতি তৈরি হয়েছিল। বাংলার আবহাওয়া পুথি রক্ষার অনুকূল নয়।

পূর্বরাগ ॥

নারী পুরুষ পরস্পরকে দেখে শুনে পরস্পরের জন্য যে আকাঙ্ক্ষায় হৃদয় মেলে ধরে তার থেকে পূর্বরাগের সৃষ্টি।

প্রসাদী ॥

রামপ্রসাদের গান। পরে সাধারণভাবে শাক্ত গানকে প্রসাদী বলা হতে থাকে। রামপ্রসাদের সহজ সুন্দর সরল বিষণ্ণ গানের টান লোকগীতির মতোই।

পয়ার ॥

দু পংক্তির কবিতা, সাধারণত সমিল। এখানে ছন্দের যতি আর অর্থের যতি একসঙ্গে পড়ে। প্রায়সময় ধীর লয়যুক্ত। বাংলা কবিতায় সবচেয়ে ব্যাপ্ত

ও প্রভাবশীল ছন্দের বন্ধন। পয়ার থেকে ক্রমে বাংলা কবিতার স্তবকের উদ্ভব ঘটেছে।

বটতলা ॥

বাংলা ছাপা বইয়ের প্রচার ও প্রসারে বটতলার ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। কলকাতার বটতলা (রবীন্দ্র সরণী)-কে কেন্দ্র ক'রে এই প্রকাশনার কাজ চলেছিল। এসব প্রকাশক বইয়ের দাম মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে কমিয়ে ফেরিওয়ালার হাতে হাতে ক্লাসিক বাংলা কবিতার বই সুলভে সাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

বিয়ের গান ॥

বিয়ের সময় গাওয়া হয়। বিয়ে এর উপজীব্য বিষয়। উর্বরতার সঙ্গে এ ধরনের গান সম্পর্কিত। পৌরাণিক দম্পতিকে আদর্শ বর-বধূরূপে চিত্রিত করা হয়। যেমন : হরগৌরী, রামসীতা। বিয়ের পদ্যের চলন হয়েছে এই ধারা বেয়ে।

ব্রত ॥

কোনো সংকল্প করে তা সিদ্ধির জন্য লৌকিক মেয়েলি অনুষ্ঠান। এর কথাভাগের সঙ্গে রূপকথার মিল। লৌকিক দেবদেবীর পূজো প্রচারের এসব গল্পের মধ্যে মঙ্গলকাব্যের বীজ লুকিয়ে আছে। মেয়েদের জন্যই ব্রতকথা ব'লে তা সংরক্ষিত এবং প্রাচীন কিছু। আল্পনাশিল্পও এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

ব্রজবুলি ॥

বৈষ্ণবপদাবলীর ভাষা। দক্ষিণ ভারতের ভক্তিগীতির বিমিশ্র ভাষা মণিপ্রবালমের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। ব্রজবুলি ব্রজভূমির ভাষা নয়। মৈথিল ও বাংলা মিশিয়ে এই শ্রুতিমধুর কাব্যভাষা তৈরি।

বাউল ॥

বাউলরা বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকধর্মের প্রতিনিধি। এঁদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান দু'সম্প্রদায়েব লোক দেখা যায়। এঁদের সহজ সাধনার পথ আচারনিষ্ঠ ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়ে এঁরা ভাবদ্রোহী। জাতপাতের ভেদ,

ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিকের থেকে অনেক দূরের এই মুক্ত মানুষরা তাঁদের একতারায় যে সুর বাজিয়েছেন তা একান্তভাবে মানবিক।

পাঁচালি ॥

মধ্যযুগের বাংলা কবিতাকে প্রায় নির্বিশেষে পাঁচালি বলা হতো। এর মধ্যে ধর্মীয় চরিত্র এবং একটানা একটি সুর থাকতো। পুতুলনাচ অভিনয়ের পরিপূরক সংলাপের সঙ্গে এর মিল থাকা অসম্ভব নয়।

ভণিতা ॥

মধ্যযুগের কবি কবিতার শেষে নিজের নাম দিতেন, অনেকসময় আনুষঙ্গিক পরিচয়ও দিতেন। সেকালে ছাপাখানা ছিল না বলে ভণিতা দরকারি ছিল। ভণিতা একদিকে ব্যক্তিগত ও অন্যদিকে সামাজিক।

মঙ্গল ॥

বাংলায় এপিকধর্মী পুরোনো আখ্যানকাব্যকে মঙ্গলকাব্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে যে গান গাওয়া হতো তার সাধারণ নাম ছিল মঙ্গল। মঙ্গলকাব্য নাম বোধহয় এই থেকে হয়েছে। মঙ্গলকবিতায় আছে মধ্যযুগের বাঙালির জীবনদর্শন ও নিজস্ব গল্প। অবশ্য সে গল্পে লৌকিক ও পৌরাণিক ধারার মিশ্রণ আছে।

মালঝাঁপ ॥

মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত একধরনের দ্রুত লয়ের ছন্দের রীতি। এ ছড়ার ছন্দ নয় এবং যুদ্ধ বাণিজ্যবিনিময়ের মতো বিশেষ কিছু প্রসঙ্গ অনুযায়ী মালঝাঁপের প্রয়োগ ঘটতো।

রুবাই ॥

বাঙালি রুবাই বলতে ওমর খৈয়ামের কবিতার চতুষ্পদী স্তবক বোঝে। এ ধরনের স্তবকে প্রতি তৃতীয় পংক্তি প্রান্তিক মিল বিহীন হয়।

সখীসংবাদ ॥

সংস্কৃত কবিতা ও নাটকে সখীর প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা ছিল। রসশাস্ত্রে সখীদের দূতিয়ালির কথাও বলা হয়েছে। এভাবে বৈষ্ণবধর্মতত্ত্বে রাধার সহচরীরা প্রাধান্য

পেলেন। সখীসাধনা নামে বৈষ্ণবধর্মের একটি শাখা তৈরি হলো। সখীদের উপস্থিতিতে খণ্ডকাব্যের কাহিনী জটিল এবং সংলাপ নাটকীয় হয়ে উঠেছে। পরে কবিওয়ালারা এই সখীসংবাদ বা সংলাপ দিয়ে কবিগান শুরু করতেন।

সন্ধ্যাভাষা ॥

তান্ত্রিক বৌদ্ধসাধকেরা এই দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় চর্যাগান রচনা করেছিলেন। সন্ধ্যাভাষী চর্যাগানের আপাত-অর্থ থেকে সেকালের জীবনের প্রকৃত ছবি স্পষ্ট। শব্দটি প্রকৃতপক্ষে, সন্ধ্যা এবং এর অর্থ আভিপ্রায়িক গোপন ভাষা, কিন্তু 'সন্ধ্যাভাষা'য় এর আলোআঁধাবি বহস্য সমান সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়।

সংকলন ॥

সংকলন কবিতার মতো প্রাচীন। যে কোনো পুবোনো ভাষায় কিছু না কিছু প্রকীর্ণ শ্লোক সংগ্রহ পাওয়া যায়। সংকলন একক বিচ্ছিন্ন বচনার তুলনায় জনপ্রিয়। বাঙালির প্রবণতা সংকলনের দিকে। চর্যাগীতিকোষ বাংলা কবিতার প্রথম সংকলনগ্রন্থ। তার পরে বৈষ্ণবপদাবলীব কিছু ভালো সংকলন মধ্যযুগে হয়েছিল।

প্রাসঙ্গিক

কবিতা বস্তুত এখনো বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অধিকাংশ বাঙালি আজও অনায়াসে সাবলীল কবিতা লেখেন, একটা বয়স পর্যন্ত লিখে যেতে পারেন অন্তত, এবং আর কিছু না হোক সে সব কবিতা পয়ার বা গদ্য-কবিতার নির্ভুল ব্যাকরণ মেনে রচনা হয়। আজ সমালোচকেরা মধ্যযুগের ধারাবাহিক আঙ্গিককে পুচ্ছগ্রাহিতার যত অপবাদ দিন, কীর্তন পাঁচালি প্রসাদী গানের দূরস্মৃতি বাঙালি পাঠকের মনে ভারি দ্রুত এবং অত্যন্ত সহজে জেগে ওঠে। এখনকার ক্লিষ্ট বাংলা বাক্-রীতির মূল ধরে যদি খানিকটা যাওয়া যায় দেখা যাবে ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তদের কবিতার ভিতর এ সমস্ত প্রবাদপ্রবচনের শিকড় ছড়িয়ে আছে। হোক ঘুড়ির কাগজে ছাপা বিয়ের পদ্য, বটতলায় লাল কালিতে ছাপানো বিষ-ঝাড়ার মন্ত্র, সহজে হোমিওপ্যাথি শেখার পুস্তিকা, হাসপাতালের দেওয়ালে পরিবার-কল্যাণের বিজ্ঞাপন কিংবা সেন্‌সাসের প্রণালীপত্র—বাঙালির কাছে সবি কবিতা এবং শেষপর্যন্ত কবিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আর, কবিরাও হোন চাষি আদিবাসী শিকারি শিক্ষক বাউল বেকার কবিরাজ কবিয়াল বাতুল বিপ্লবী—কবিতায় তাঁদের কারো কোথাও হারিয়ে যাওয়ার কোনো মানা নেই। এমনকি কবিতাকার নামেও খুশি নন তাঁরা, তাঁরা কবি। এখনো যখন নাকি ঐতিহ্যের অর্থ হয় অসাড় অন্ধ অনুবর্তন নয় বন্ধ্যা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তখনো বাংলার মাটি আর জল আর মন আর প্রাণে বাংলা কবিতা এক সম্পৃক্ত দ্রবণ।

প্রাচীন কবিতা সম্পর্কে একথা আরো বেশি প্রযোজ্য হতে পারবে। একথা ঠিক যে বিশশতকি আধুনিক বাংলা কবিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক পাঠক দেখেছেন এ জিনিশ পরিপূর্ণভাবে অপরিচিত, উচ্চারিতভাবে দুর্বোধ্য, এবং

এই ক্ষতিকর স্বীকৃতিতে তাঁদের বিন্দুমাত্র অপ্রতিভতা নেই। অথচ এঁরা কৃত্তিবাস রামপ্রসাদ কবিকঙ্কণ বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও এমনতরো অবোধ্যতার স্বীকারোক্তি আর করেন না। আসলে যতই কবিতার পাৎলা কাগজ অনিয়মিতভাবে অসংখ্য প্রকাশ পেতে থাকুক, গ্রামে গঞ্জে যত্রতত্র কবিসম্মেলন হোক, কফিঘরে কবিতাআন্দোলন নিয়ে উদ্দণ্ড আলোচনা চলুক, বাংলায় কবিতার দাম আর কাণাকড়িও বাড়ে নি। কোনো দেশেই আর তেমন বাড়ে নি অবশ্য, তবু বাংলায় কবিতা তার স্বতঃস্ফূর্ত মূল্য ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে মনে হয় অথবা তা এক পবিত্র সম্ভ্রান্ত অনুষ্ঠানে উন্নীত হচ্ছে বোধ হতে থাকে। তবু সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার দুরূহতা দুর্বোধ্যতা নিয়ে এই অশেষ বাদানুবাদ এদেশি পাঠকের সপ্রেম কলহের একটি ভঙ্গিমাত্র এবং তরুণ কবিরা পশ্চিমি প্রথায় কেবলি হতাশা নিরাশা শূন্যতা অবক্ষয়ের গান গাইতে চাইলেও পাঠকদের কাছ থেকে যা পেয়ে আসেন তা কমবেশি প্রিয়সস্মিত প্রশ্রয়।

হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাস এই দৃষ্টিভঙ্গিমাটুকু তৈরি করে দিতে পেরেছে। এলোমেলো, এ সংকলনের অমনস্ক পাতা উল্টে গেলেও একই প্রসঙ্গের অনবরত আঘাতে, একই কল্পচিত্রের পুনরাবৃত্ত অভিঘাতে ফিরে ফিরে আশ্চর্য হতে হয়। তেরো শতকের ব্রতের গানে ঢেঁকির মন্ত্র বাঁধা পড়েছে আর বিশ শতকের বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অন্নদেবতার স্তোত্র রচনা করে চলেছেন। শুধু অন্নময় কোষে নয়, বাঙালি কবির জীবনরসের অন্বেষণ সর্বত্র। এ কবিতা শুধু মধুর নয়, এ কবিতা শুধু লিরিক নয়। জীবনের সব তুমুল ঘটনায় বাংলা কবিতার বাঁধ ভেঙেছে, পাড় ধ্বসেছে, ধার বেড়েছে, গড়ে উঠেছে কিছু বিস্মিত বাঁক। মানবপ্রকৃতি আর নিসর্গ মিলেমিশে আছে তার মধ্যে, আছে অনেক উষাগোধূলির আচ্ছন্ন সন্ধ্যাভাষা, অনেক সহোদরের শানিত তিরস্কারের মতো রোদ, খরা, খরার পরে বন্যা, নিরক্ষর নিরন্ন নগ্ন মানুষগুলির ভাগ্যরেখায় ফুঁসে ওঠা নদী এবং মেঘ আর শতাব্দীর ঝুরিনামা গ্রামের প্রান্তে মেঘের পরে জমেওঠা মেঘ, অবিশ্রাম বর্ষণ আর কর্ষণ আর প্রজনন আর মৃত্যু।

অদ্ভুত লাগে এই পটভূমিকাতেও বাংলা কবিতাকে যখন কেবলি শুদ্ধ ভাবব্যাকুলতায় বিশিষ্টভাবে বিহ্বল বলা হয়। ভাবাবিষ্ট ভালো বাংলা লিরিকের সংখ্যা কম নয় ঠিকই, কিন্তু তার প্রধান কৃতিত্ব এখনো রোমান্টিক ঔপনিবেশিক আবেশের প্রাপ্য। মধ্যযুগের ভাব-বিহ্বলতা কৃত্তিবাসকে দিয়ে মহাকাব্যের বদলে রামপাঁচালি লিখিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্তু তা পারিবারিক জীবননাট্য, তুলসীদাসের রামচরিতমানসের ভক্তিবিগলিত আপ্লুত মানসিকতা

নয়। বাংলায় আধুনিককালে শাক্ত গান ব্রাহ্ম গান লেখা হয়েছে কিন্তু সাম্প্রতিক মারাঠি কবিতায় যেমন একটি ধারা ভক্তিভাবের দিকে উজিয়ে গেছে, বাংলা কবিতায় তেমন কিছু হয় নি। ব্যাঙের ডাকে যেমন বাঙালিতম বর্ষার ঠিক সুরটি লাগে, তেমনি বাংলা কবিতার কোমলতার সঙ্গে তর্কের ঈষৎ কর্কশতা না মেশালে আমাদের অলংকরণ সম্পূর্ণ হয় না। বাংলা কবিতার প্রথম সংকলন চর্যাগান থেকেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ভালো মন্দের দিকে সমান ঔদাসীন্য নিয়ে যাওয়া বাংলা কবিতার স্বভাব নয়, নিরপেক্ষ চিত্রণ তার লক্ষ্য নয়, এ কাব্যে প্রখর নীতিবোধ জেগে থেকে বিতর্কের উপাদান সংগ্রহ করে নিতে ভালোবাসে।

এর ফলে বাংলা কবিতার রচনারীতি এক উভযোজ্যতার লক্ষণে আক্রান্ত হয়। এর একদিকে থাকে প্রতীকী ব্যঞ্জনার দিকে ঝোঁক, এক পায়ে দাঁড়ানো খোয়ায়ের দীর্ঘ তালগাছের মতো অনির্দেশ্যকে দিক দেখানোর প্রবণতা, আর অন্যদিকে থাকে অনর্থক অতিরেক, অপর্যাপ্ত অতিকথন, পুঞ্জিত শ্যামসমারোহে নীলাঞ্জনছায়ায় নেমে আসা আশ্চর্য সব অতিশয়োক্তি। বাঙালি পটুয়ার লেখা সেই সব সহজ সুলভ সুন্দর ছবির সঙ্গে এর মিল, যেখানে কান ছাড়িয়ে মুখমণ্ডল ছাপিয়ে যায় প্রতিমার টানাটানা দীর্ঘ চোখ, আর একইসঙ্গে সংহৃত জ্যামিতিক খাড়া টানে খরচাপে তৈরি হয় পানপাতার মতো শ্রীমতীর মুখের টানটান আদল। সমাধুনিক বাংলা কবিতা যে আজ উনিশশো চিরন্তনের সমবয়সী, তা এইজন্যেও।

বাংলা কবিতার ইতিহাস বাঙালির নিজেকে খোঁজার ইতিহাস এবং সে ইতিহাস স্ববিরোধ/সমন্বয়কে স্বীকার ক'রে সত্য। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রগতির কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ বাংলা কবিতার চরিত্রে এই সাধারণ জটিলতাটুকু প্রত্যাশিত এবং নিরক্ষর মানুষের দেশে কবিতা রচনা ও মূল্যায়নের সমস্যা যেহেতু শিক্ষিত দেশের সমস্যার সঙ্গে কোনোমতে মেলে না তাই কবিতার মূল্যনির্দেশের পশ্চিমি মাপকাঠি বাংলা কবিতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে লাগসই কিছু নয় এবং এভাবে গ্রন্থিমোচন অনেকসময় সমস্যার অতিসরলীকরণ মাত্র। এ সংকলন বাংলা কবিতার এই সব নিহিত স্ববিরোধ বরং খুঁজে পেতে উৎসাহী, একটি মাধ্যমমণ্ডলের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সংশ্লেষে তাকে মুক্তি দিতে আগ্রহী। পালযুগ থেকে বাংলাদেশ তৈরি হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রচিন্তার যে ধারাবাহিক উন্মেষ, তালপাতার পুঁথি থেকে অফসেটে ছাপা পর্যন্ত লিখিত বাংলা কবিতার যে

মন্থর বিকাশ, মৌখিক লৌকিক বাংলাসাহিত্যের যে উন্নতি ও পরিণতি—এ সংকলন তারই দীর্ঘ ছিন্ন টানাপোড়েনে বোনা এক নকশিকাঁথা ছাড়া কিছু নয়।

আত্মতার সমস্যা তাই এ কবিতার প্রথম ও প্রধান সমস্যা। বাংলা কবিতা খুব বেশি হলেও এক হাজার বছরের পুরোনো, কিন্তু তার আগেও তিন হাজার বছরের ভারতীয় সাহিত্যের এক প্রবল অধিকারী ঐতিহ্য আছে। রাতারাতি চর্যাগানের কবিতার ভাষা গড়ে ওঠে নি, বাংলা তার আগে নিশ্চয় মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে, প্রাকৃত/অপভ্রংশ লৌকিক ভাষারূপে স্বীকৃতি পেলেও সারস্বত ভাষা হিশেবে অনুরূপভাবে পরে গৃহীত হয়েছিল। প্রাচীন যুগে সংস্কৃত সম্মানিত ভাষা ছিল, তবু সংস্কৃতে বাংলা কবিতার অভিঘাত যে লাগে নি তা নয়। চর্যাগান বাংলা, মুনিদত্ত সংস্কৃতে তার টীকা রচনা করেছেন। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ সংস্কৃতের শেষ ক্লাসিক কাব্য, কিন্তু তার ছন্দ মিল ভাব ভাষা বাঙালি ধরনের। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোথাও কোথাও জয়দেব থেকে প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করলেও তাই বলার কিছু নেই, মুরারিগুপ্ত, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র সংস্কৃতে কিছু রচনা করলেও কোনো দ্বৈভাষিক মানুষের সাংস্কৃতিক সমস্যাও এজন্য তাঁদের সামনে ছিল না। সংস্কৃতের বদলে অন্য কোনো কাব্য-ভাষা পেলে তাঁরা নিতেন, নিয়েও ছিলেন, ব্রজবুলি নামের একটি বিমিশ্র আন্তঃ-প্রাদেশিক সারস্বত ভাষা মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় ক্রমশ ব্যাপক ব্যবহার পেয়েছিল। আর দশটা ভারতীয় ভাষার মতো বাংলাও প্রথমের দিকে সংস্কৃত জগৎ থেকে কবিতার বিষয় বেছে নিয়েছে, কিন্তু অসংস্কৃত ধর্ম-অনপেক্ষ প্রসঙ্গ নিয়েও যে কিছু প্রত্ন-বাংলাকাব্য লেখা হয় নি তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। হয় তো হয়েছে, পাওয়া যায় নি। হয় তো লোকমুখে প্রচলিত ছিল, তাকে পবিত্র পুঁথিতে তুলে নিয়ে পুজোর ঘরে সিঁদুর চন্দনে চর্চিত ক'রে রাখা হয় নি।

বাংলা সংস্কৃতের মতো পরিশীলিত সম্মানিত ভাষা ছিল না ব'লে যে এখানে তাত্ত্বিক সাহিত্যিক আলোচনার কোনো ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি এ অভিযোগও তোলা উচিত হবে না। থাকে থাকে সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রীরা যখন অবক্ষয়ী অলংকারের বর্গীকরণে ব্যস্ত, কাব্যরচনার অভ্রান্ত প্রণালীনির্ধারণে নিবিষ্টচিত্ত, চর্যাগীতিকার তখন তুড়ি মেরে ছন্দের বন্ধন উড়িয়ে দিতে প্রস্তুত: এড়ি এড় ছান্দক বান্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা কবিতা ও বাংলা কবিতার আলোচনা দুটি আলাদা ধারা নয়, এরা পরস্পরে সংলগ্ন, সংমিশ্রিত। প্রবন্ধের মাঝেমধ্যে যেমন

পাদটীকা, বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তেমনি সংস্কৃত শ্লোকের উল্লিখন বুনে দিলেন। কাব্যরচনার ক্ষেত্রে আমরা প্রেরণায় বিশ্বাস করি, চণ্ডী স্বপ্নে পত্র-মসী নিয়ে দেখা দিয়েছেন আমায়ঃ ব'লে উঠলেন উপবাসী মুকুন্দ। প্রেরণায় বিশ্বাস করি আমরাঃ সমস্বর ব'লে উঠলেন ধর্মমঙ্গলের কবিরা, সিপাহীর বেশে ধর্মঠাকুর এসে তাঁদের বেগার খাটতে নিয়ে চলে গেলেন। প্রেরণায় বিশ্বাস করি আমি, অন্নপূর্ণা আমাকে কাব্যরচনার আদেশ দিয়েছেনঃ ভুরু কুঁচকে হেসে উঠলেন ভারতচন্দ্র, তাঁকে নতুন মঙ্গল রচনার আজ্ঞা দিয়েছেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। প্রেরণা মানি না আমিঃ প্রতিবাদ করে উঠলেন রামানন্দ যতী, তাঁর ক্ষীণকণ্ঠ এক ঢেউয়ে ভেসে গেল। বাংলা কাব্য সমালোচনার এই অন্তর্লীন ইতিহাসের উদ্ঘাটন এ সংকলনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। মঙ্গলকাব্য তাই এখানে মাত্রাতিরিক্ত স্থান পায়, কারণ তার আঙ্গিক প্রথাসিদ্ধ প্রকরণের একঘেয়ে অভিযোগকে অস্বীকার ক'রে একটি এপিকপ্রতিম কাঠামোয় বাঙালির লোকজীবনকে বারবার তুলে দেখাতে ইচ্ছুক। আর রূপ গোস্বামীর মতো রসশাস্ত্রীর তাত্ত্বিক সংস্কৃত নির্দেশের বিড়ম্বনায় ক্লান্তিকর পুচ্ছানুগ্রাহিতায় প্রস্তুত বৈষ্ণবপদাবলী থেকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের আঁচলাগা মাত্র কয়েকটি গান এ সঞ্চয়িতায় সংগৃহীত। প্রসঙ্গত আরো বলা যায়, প্রত্যাহার ও নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সংকলনও একধরনের সাহিত্যসমালোচনা—চর্যাগীতিকোষ থেকে মধ্যযুগের বৈষ্ণবপদাবলীর সংকলন গ্রন্থগুলি হয়ে এই সাম্প্রতিক সংকলনটি পর্যন্ত সমালোচক বাঙালির নিয়ত পদযাত্রা চলেছে। তাছাড়া ভালো কবিতা থেকে খারাপ কবিতাকে শ্রেণীশত্রুর মতো শনাক্ত ক'রে দেখানোর আরোপিত দায় বাংলা কবিতার উপর কোনোদিনই ছিল না। বাঙালি জানেন ব্যবহারিক মূল্যের জন্য এ কবিতা আছে, যেমন আছে ঘরে মাটির কলস, নিত্যদিন জলভরণের সামগ্রী, এমনিতেই সুডৌল, মসৃণ, বিচিত্রিত—তবু ভেঙে গেলে ফেলে দিয়ে আবার একটি সংগ্রহ করা যায়ঃ তেমনই স্নিগ্ধ, নিটোল, সুলভ, সুন্দর।

মুসলিম সম্রাটদের রাজসভার ভাষা যদিও ছিল ফারসি এবং বাঙালি মেয়েরা যদিও সেঁজুতিব্রতের মন্ত্র পড়তেন আর্শি আর্শি আর্শি/আমার স্বামী পড়ুক ফার্সি তবু রাজতন্ত্র বাংলা ভাষায় বাঙালির প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতারচনাকে ক্রমশ সমর্থন করে চলেছিল এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের দিক থেকে বাঙালি মুসলমানরা বেশি বাঙালি হয়ে পড়েছিলেন। এই যোগাযোগের ফলে যাকে বলে দরবারি সাহিত্য তা কখনো বাংলায় গড়ে ওঠে নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রাজসভার সাহিত্য নামে একটি নির্দিষ্ট অধ্যায় থাকে বটে, কিন্তু তা রাজসভার

চেয়ে বেশি সামন্ত-সভা, এবং পশ্চিমি সামন্ততন্ত্রের ধারণার সঙ্গে সে সামন্ত-সভা যেমন পুরো মেলে না, তেমনি রাজসভার কাব্যের বৈভব ও বিলাস, পরিশীলন ও অবক্ষয় বাংলা কবিতায় তেমন প্রবলভাবে নেই। মধুসূদন উনিশ শতকে রাজসভাকবি হতে চেয়েছিলেন, সে রাজসভা তাঁর মেঘনাদবধকাব্যের রাবণের রাজসভা, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কোথাও তার বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। এরই মধ্যে মুকুন্দ কবিকঙ্কণ উপাধি পেয়েছেন, পাটের পাছড়া দিয়ে কৃত্তিবাসকে গৌড়ের রাজা সম্মানিত করেছেন, আনুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষণে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের কাব্যরচনার পথ প্রশস্ত হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বাংলা কবিতা আভিজাত্যের অহংকাবে অসংস্কৃত গ্রামীণ লোক-সাহিত্যকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দেয় নি।

বাংলা কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশের পথ খুঁজছিল খুঁড়ছিল। খুব সচেতন ছিল না সে সন্ধান, তবে স্বভাবে খোলামেলা ছিল। অধিকাংশ নতুন ভারতীয় ভাষা প্রথম পর্বে অনুবাদের উপর বেশি ঝোঁক দিলেও বাংলায় অনুবাদের প্রবণতা পরে এসেছে, একধরনের শিথিল অভিঘাত নিয়ে এসেছে তা। মূল রামায়ণে যেমন প্রক্ষেপ ও সংযোজনের বহু স্তর আছে তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রচলিত নানান বাঙালি লোকআখ্যানকে আত্মসাৎ ক'রে অনুবাদ হয়েও প্রায় মৌলিক রচনা, কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত ভণিতা নিয়ে নানা রূপান্তরের মধ্যে চলে গিয়ে প্রায় লোকসাহিত্য। মধ্যযুগ বাংলা কবিতাকে মননের সে ঔদার্য দিয়েছে যা ক্লাসিক রচনায় থাকে, যাতে রচয়িতাব নাম থাকুক না থাকুক কিছুতেই কিছু এসে যায় না, মনে হয় স্বাভাবিকভাবে এটা হয়েছিল, এটা আছে। তাই প্রত্যাশিত মনে হয় শেখরের একটি ভালো পদ যখন বিদ্যাপতি দাবি করে বসেন, চণ্ডীদাস পূর্বচৈতন্যযুগ থেকে উত্তর-চৈতন্যযুগ পর্যন্ত শত শত বছর ধরে উৎকৃষ্ট পদ রচনা করে চলেন, কৃত্তিবাসের নামে রামায়ণের পনেরোশো পুঁথি পাওয়া যায়, লালু নন্দলাল দুভায়ের কে কোন কবিগান লিখেছেন তা শনাক্ত কবা যায় না, রবীন্দ্রনাথ এক মহিলা কবিব রচনা না জেনে নিজের কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে নেন, পূর্ববঙ্গের প্রাচীন গীতিকায় স্বরচিত পদ ছড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাহক সে সব ব্যালাড প্রামাণ্য ব'লে দাবি করেন, করুণানিধান কবিতা লিখলে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বা তাঁর সমকালীনদের অনুভববেদ্য স্পর্শ পাওয়া যায় আর এই বিশ শতকের আটের দশকের বাঙালি কিশোরকদের কবিতা পরস্পরের প্রতিলিপি মনে হয়। সাম্প্রতিক মার্কিন গদ্য যেমন উৎকর্ষের একটা সাধারণ স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে এও তেমনি।

কাব্যভাষার এই নির্দিষ্ট মান তৈরি হয়েছে যেমন অসচেতনভাবে, তেমনি অন্যমনস্কতায় প্রান্তিক অঞ্চলের উপভাষাগুলিও সহজে বাংলা কবিতায় ঢুকে পড়েছে। কবিতার সামাজিক মূল্য এবং শ্রেণীচৈতন্যের ক্ষেত্রে উপভাষার বিশিষ্ট ভূমিকা থাকলেও বাংলায় এখনো তার মূল্যনির্দেশের চেষ্টা হয় নি। অথচ চর্যাগান, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ব্রজবুলি, পূর্ব-পশ্চিম-উত্তরবঙ্গের মঙ্গলকাব্য, ময়মনসিংহগীতিকা এমনকি জীবনানন্দর কবিতা আলোচনা করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে উপভাষার কথা এসে পড়ে। এ ব্যবধান গ্রাম ও নগরের ভাষার ব্যবধানও বটে। চণ্ডীদাস বা জসীমউদ্দীনের কবিতায় ওই গ্রামীণ স্বর, তাকে উনিশ শতকি সমালোচনায় খাঁটি বাংলার স্বর ব'লে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার মানেও তা-ই। মেয়ে আর পুরুষদের, বিশেষ করে নিচুতলার পুরুষদের, ভাষাও এখানে সংস্কৃতের মতো আলাদা। কুক্কুরীপার চর্যাগানে, কবিকঙ্কণের লহনার লাঞ্ছনায় মেয়েলি ভাষা ও ছন্দের ব্যবহার শিষ্ট পুরুষদের ভাষার থেকে আলাদা। উনিশ শতকের মহিলা কবির কণ্ঠস্বর এ জন্য অন্যরকম। তবু এরি মধ্যে পুরুষ কবিয়াল সখীসংবাদ গেয়েছেন, মধুসূদন অমিত্রাক্ষরের পুরুষ তরঙ্গভঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন রে লো-র ললিতকল্লোল।

ততদিনে ইংরেজি বাঙালির মননের প্রভু হয়ে উঠেছে, ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখছেন বাঙালি কবিরা, মধুসূদন অরবিন্দ বিবেকানন্দ তরু দত্ত ইংরেজিতে কবিতা লিখছেন এবং এখনো ইংরেজি ভাষায় লেখা ভারতীয় কবিতার একটা বড়ো অংশ বাঙালিদের রচনা। কিন্তু তাতে বাংলা কবিতার অধিকারবোধ জেগে ওঠে নি, ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ হয়েছে, এমন বলা যায় না। ভাস্কর যেমন একখণ্ড পাথর কেটে মূর্তি বানান, মধুসূদন তেমনি নানা ভাষা ও সাহিত্য ছেনে বাংলা কবিতার ভাবমূর্তি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ইংরেজিতে এক অনন্য সৃষ্টি, আলাদা এমন একটি মৌল রচনা যা আবার বাংলা কবিতায় অনুবাদ করলে নতুন রসের ক্ষরণ ঘটবে, যা পরভাষায় রচিত হলেও দেশে ও বিদেশে বাংলা কবিতারই আদর বাড়িয়েছে। পরবর্তীকালেও জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দে প্রভৃতির ইংরেজি বিদ্যাচর্চা বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বাঙালি কবিদের কাছে ইংরেজি কখনো শুধু ইংরেজি নয়, তা পাশ্চাত্য, তা বিশ্বের সঙ্গে সেতুবন্ধন। প্রত্যেক বাঙালি কবির যে মৌলিক অন্তঃপ্রকৃতি তা তাঁর সার্থক রচনায় স্বাশ্রয়ী মূল্য নিয়ে প্রতিভাত, রোমান্টিক না ক্লাসিক তা সমালোচকেরা পরে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু তার আগে পূর্ববর্তী আবহমান বিশ্বসাহিত্যের

কাছে নবীন বাঙালি কবি সাহায্য, ঋণ ও পরামর্শের জন্য চলে গিয়েছেন; তবু শেষ পর্যন্ত কবিতার দুটি ভাগ : বাংলা কবিতা এবং বাংলা ভাষায় লেখা নয় এমন সব কবিতা।

বেসরকারি একটা ভাষায় লেখা ব'লে সচেতনভাবে আর প্রবণতাবশে বাংলা কবিতা লোককাব্য হয়ে উঠেছিল। এর চরিত্র অনান্দনিক, এর স্বভাব গ্রাম্য, নিরক্ষর সাহিত্যরুচিহীন এই সব বচনা থেকে কোনো শীলিত প্রসাদ কখনো পাওয়া যাবে না—এই অজুহাতে লোককবিতাকে অনেকটাই আমরা বর্জন এবং উপেক্ষা করে এসেছি। তবু লোককবিতার ঐতিহ্য যে বাংলায় সক্রিয়, একথা বলা বেশি হবে। ইন্দো-য়োরোপিয় ভাষাগোষ্ঠী নামের একটি কল্পকথার সঙ্গে বাংলা ভাষার প্রকৃত যোগ কতটা এটা যেমন আজ যাচাই ক'রে নেওয়ার দিন এসেছে, তেমনি দেখা দরকার দেশজ অন্-আর্য উপাদানসমূহ কোথায় কিভাবে বাংলা কবিতা অঙ্গীকার করে নিতে পেরেছে। ইংরেজিশাসিত পশ্চিমি সমালোচনার মানদণ্ড নামিয়ে না ধরলে, এই জন্যই বাংলা কবিতার যথাযথ মূল্যায়ন হবার নয়। কবিতার ইতিহাস চিরকাল অনুকারী আঙ্গিকের উপর অধিকৃত আঙ্গিকের বিজয়ের ইতিহাস, পরিশীলিত কবিব্যক্তিত্বের নিয়তির মতো লোকঐতিহ্যকে অর্জন ক'রে নেওয়ার ইতিহাস। কিন্তু অক্ষর-বৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের সরলীকৃত বিভাজনে বাংলা কবিতার ছন্দের তারতম্য কখনো পরিপূর্ণভাবে ধরা দেবে না, পয়াররীতির ধীরতা কেন সহসা মালঝাঁপের ক্ষিপ্রতায় পর্যবসিত, কেনই বা ছড়ার ছন্দে চঞ্চল—এই প্রাণস্বভাবটিকে পরীক্ষা ক'রে নেওয়ার জন্য লোকায়ত কাব্যরীতির কাছে আবারও যাওয়া জরুরি হবে। প্রত্যেক বিবৃতির নিজস্ব প্রণালী আছে আর অর্থ দেখো না, ব্যবহার ছাখো—নব্যদর্শনের এই দুটি প্রতিজ্ঞা বাংলা লোককবিতার আলোচনায় এজন্য অবশ্যমান্য। লোকসাহিত্য যাদের জন্য তাদের কাছে তা সাহিত্য নয়; সারস্বতমূল্যযুক্ত কিছু বলেই উপযোগী এমন নয়, তার ব্যবহারিক মূল্যটুকু তাদের প্রধান বিবেচনার বিষয়। এ সংকলনে লোককাব্যের উদ্ধৃতিগুলি তাই সামাজিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচ্য। বাংলা কবিতায় পুরাণ-প্রসঙ্গ আর লোকজীবনের প্রসঙ্গ বারবার একাকার হয়ে যায় কেন, কেন এদেশের আলংকারিক মহাকাব্যও স্বভাবে ব্যালাডের মতো—এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে জনসভায় না গিয়ে উপায় নেই।

এই ব্যবহারিক উপযোগকে অস্বীকার করা হয় তাই বাংলা কবিতার ধর্মীয় চরিত্র বা সাম্প্রদায়িক চেহারা অথবা তার আঙ্গিকগত সীমাবদ্ধতা এতো বেশি

ক'রে চোখে পড়ে। ধর্ম ছিল মধ্যযুগের রাজনীতি এবং ধর্ম আন্দোলন রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের পথ সুগম ক'রে দিয়েছে এ দেখা গেছে। তাহলেও বাংলা কবিতার ইতিহাসে ধর্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষ উপাদানের অনুঘটক, শেষ-পর্যন্ত মানবিক আবেদন তাই ধর্মীয় আবেদনকে আত্মসাৎ করে নিয়েছে। বৈষ্ণবপদাবলীর যশোদা-কৃষ্ণ তাই অবশেষে মা ও ছেলে, রাধা-কৃষ্ণ প্রেমিক প্রেমিকা। হিন্দু প্রসঙ্গ নিয়ে মুসলমান কবিদের বাংলা কবিতা রচনায় তাই বাধা ছিল না, ইসলামি বিষয় নিয়ে হিন্দু কবির রচনাও তেমনি কোথাও বাধে নি। বাংলা কবিতায় ধর্ম কেমন একটা ক্রমশ উদ্বায়ী ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ তার একটি সুন্দর উদাহরণ। শাস্ত্রীয়/ধর্মীয় অনুশাসন পুরোনো জিনিশ চাইলেও বাংলা কবিতার পৃষ্ঠপোষকরা চেয়েছেন সমসাময়িক যুগরুচির অনুবর্তন। এই বিপরীতের সন্নিপাতে কবিতা কোথাও বাংলার লৌকিক দেবতার মতোই আদিম অথচ কিম্ভূতভাবে নতুন, আর কোথাও তা ছকে-বাঁধা বৈষ্ণবগানের আর মঙ্গলকাব্যের বাইরে গিয়ে অন্যধরনের বৈষ্ণবকাব্য আর অন্যধরনের মঙ্গলকাব্যরচনায় তৎপর।

বাংলা কবিতার ইতিহাসের উৎস সন্ধানে সংস্কৃত ভাষা ও ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির কাছে যাওয়ার চেয়ে বাংলার আদিবাসী উপজাতিদের লোকবিশ্বাস এবং জীবনাচরণের মধ্যে যাওয়া অনেক বেশি লাভজনক। বাংলা কবিতার বাংলা গানের ধারাবাহিক ঐতিহ্য আছে কিন্তু প্রামাণ্য ইতিহাস যে নেই তা এইজন্যই। মেদিনীপুরের পটের আর বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজের প্রশংসা করে ফেলা এজন্য বাংলা কবিতার প্রশংসা করার চেয়ে বেশি সহজ। বাঙালি পট টেরাকোটার প্রশংসা শুরু করেছে য়োরোপিয়দের দেখাদেখি, বাঙালির বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক লোক-দেখানো আদরও সেই ধাতের। ইংরেজরা না এলে বাংলা কবিতাকে কখনো শিল্পকর্ম রূপে স্বাশ্রয়ী মূল্য দেওয়া হতো না, গ্রামীণ অমার্জিত অপরিশীলিত সৃষ্টিকর্ম হিশেবে উদাসীন অবজ্ঞা করা হতো। কিন্তু বাংলা কবিতার মুক্তি ঘটে চলেছে একটি লোকায়ত ক্ষেত্রে, একটি মাধ্যম-মণ্ডলের মধ্যে তার উদ্ধার। দক্ষিণভারতীয় সংগীত ও নৃত্যকলা কাব্যের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে, বাংলায় অবশ্য তেমন কিছু হয় নি। চর্যাগানগুলিতে যদিও বিশেষ কিছু জানা যায় না তবু রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে। চর্যাগান এখনো নেপালে গীত হয়। তার সঙ্গে নাচের সহযোগ থাকে। বিশুদ্ধ কবিতা নামে একটি ব্যাপার সকলে বুঝে উঠতে পারেন না, তাই আনুষঙ্গিক আমোদের এরকম ব্যবস্থা রাখতে হয়। বৌদ্ধমঠে অভিনয়ের রেওয়াজ এমনিতে পুরোনো।

নাটগীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা পাঁচালি শব্দগুলি প্রমাণ করে এর মূলে রয়েছে আদিম সমাজের নন্দিত কৌম প্রবর্তনা। কীর্তনও তাই। বাংলা কবিতায় যে বাঁশের বাঁশি বাজে, বিয়ের সময় যে নাচগানের উল্লেখ পাওয়া যায় তা উপজাতিদের কাছ থেকে নেওয়া। পৈশাচী প্রাকৃতের মধ্যে যেমন কথাসরিৎ-সাগরের গল্পগুলি ডুবে ছিল মঙ্গলকাব্যও তেমনি প্রাকৃত জীবনের বৃহৎকথা।

যে সমাজ মঙ্গলকাব্যে সুখপ্রদ সমাপ্তি সম্ভব করে তুলেছিল সে সমাজে বহুবিবাহপ্রথা থাকলেও তা আদিবাসী উপজাতিদের সমাজ নয়। এগারো শতকের জৈন সংস্কৃতে সোমদেব বণিকদের খুশি করার জন্য গল্প বেঁধেছেন, মঙ্গলকাব্যেও এই বেনেদের শিল্পীদের প্রতিপত্তি। নান্দনিক সুদূরতা যদি শীতলতার অন্যনাম হয় তা হলে এই সহৃদয় সামাজিকতা ভালো। মধ্যযুগেব সৃষ্টিকর্মগুলি এদিক থেকে নিজেরাই মূল্যনির্দেশের সহায়ক, কেননা এদের রচনার বিশিষ্টতা পাঠককে এখন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির সুযোগ করে দেয়। সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমিকা বাংলা কবিতায় চিরকাল আছে কিন্তু তা বিশ্লেষণ করে দেখার মতো সাক্ষ্যপ্রমাণ বা মানসিকতা সবসময়ের পাঠকের নেই। রাজনৈতিক অভ্যুত্থান উর্দু কবিতায় গাঢ় ছাপ ফেলেছে কিন্তু সিপাহিবিদ্রোহ উর্দু কবিতায় রূপান্তর ঘটালেও তা বাংলা কবিতায় সঙ্গতভাবে কোনো প্রভাব ফেলে নি, তেমনি তার কোনো প্রভাব পড়ে নি বাঙালি জীবনেও। গঙ্গারাম দত্তের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' থেকে বর্গি হাঙ্গামার ছবি তুলে ধরতে চাইলেও তাই উপায় থাকে না, বই পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় না উনিশ শতকের বানের ছড়া, সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া। অথচ বাংলা কবিতা সমাজের জীবনে প্রতিফলিত পরিবর্তনের প্রতিমা এ বিশ্বাসও প্রাণপণে রক্ষা করার মতো কিছু। মানুষকে ধৃতিকেন্দ্রে রেখে যে কবিতা প্রেরণা সঞ্চয় করে ঐতিহাসিকতার মূল তার মর্মে নিহিত।

সংকলনের দিকে বাঙালির স্বাভাবিক প্রবণতা এবং সে সংকলনের অর্থ কবিতার ইতিহাস রচনা। কবিতা রচনা কবিতার ইতিহাস রচনার চেয়ে বলা বাহুল্য অনেক বেশি দরকারি। আজ ও বিগতকালের বাংলাভাষী পাঠক তাই এ সংকলনের ভালোমন্দমাঝারি কিন্তু জরুরি কিছু কবিতা নির্বাচন করেছেন। তবু এই মুহূর্তে ওই নির্বাচনও আর যথেষ্ট নয়। এখন যে কোনো সময় ইতিহাস এবং কবিতার ইতিহাস সহসা থেমে যেতে পারে এমন সঙ্গত সন্দেহের দায়ে তাঁরা ঠেকেছেন।

কয়েকটি দিক থেকে পূর্ববর্তী সংকলনগুলির সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ার মতো। প্রথমত, বাংলা কবিতার প্রাচীন পর্যায়টিকে সকলে সুনির্দিষ্টভাবে বর্জন করেছেন। এতে কালগতভাবে বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের কয়েক শতক যে শুধু খণ্ডিত হয় তা নয়। এটি শুধু বাংলা নয়, নতুনভারতীয় আর্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম দলিল। বাংলা কবিতা এখনো তার উপমারূপকনির্ভর প্রকাশরীতিতে, প্রবাদপ্রবচন নির্ভর লোকভাষার ব্যবহারে, লোকজীবননির্ভর আবেগস্পৃষ্ট বিশ্বাসলাঞ্ছিত দুঃখবাদী ছোটো ছোটো লিরিক রচনায় চর্যাগীতির উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। এখানে ভাবগত দুর্বোধ্যতা বা ভাষাগত দুরূহতার অভিযোগ টেকে না কারণ আধুনিক কবিতার দুর্ভেদ্য ব্যূহ এসব পাঠকরাই ভেদ করে চলেছেন। মার্কিন ইণ্ডিআন কবিতা তার গহন ক্রিপ্টিক স্বভাব নিয়েও যেমন ইংরেজি অনুবাদে টীকাভাষ্যসমেত গ্রাহ্য, সন্ধ্যাভাষী চর্যাগানও তেমনি। বাংলা কবিতার ইতিহাসকে আদ্যন্ত অঙ্গীকার করে এ সংকলন তৈরি।

দ্বিতীয়ত অগ্রজ সংকলনগুলি বাংলা কবিতার প্রাচীন যুগকে শুধু অস্বীকার করেন নি, মধ্যযুগকেও তার প্রাপ্য আনুপাতিক গুরুত্ব থেকে বঞ্চিত করেছেন। বাংলা কবিতার চরিত্র গঠনে অনুবাদের অনিবার্য ভূমিকা থাকলেও তা এসব সংকলনে অস্বীকৃত হয়েছে। অথচ ভিকটোরিয় কবিতার কোনো সংগ্রহ থেকে ফিটজেরাল্ডকে বাদ দেওয়া যেমন শক্ত বাংলা কবিতার সংকলন থেকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাদ দেওয়া তার চেয়ে আরো কঠিন কাজ। এর ফলে প্রভাব অনুযায়ী কবিদের সংস্থান ওই সব সংগ্রন্থনে নির্দিষ্ট ছিল না। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের যেমন তেমনি মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দের অপ্রতিহত প্রভাব ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাঁর আসন ফলে সংকুচিত হয়ে পড়েছে। অথচ প্রাণ, স্বাস্থ্য, সমাজের সব স্তর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা, সঙ্গত অতিশায়ন ও শান্ত শ্লেষে বাংলা কবিতায় মুকুন্দর জুড়ি নেই। তুলনা করলে সাম্প্রতিক সংকলকদের মধ্যে তথাকথিত আধুনিক মনস্কতা পীড়াদায়কভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশবিশ শতক অভ্যাসবশেই যেন এসব সঞ্চয়নে সিংহভাগ পেয়ে থাকে।

তৃতীয়ত বাংলা যদিও লোকভাষা তবু শিষ্টসাহিত্যের তুলনায় মৌখিক লোকায়ত কাব্য এসব সংকলনে প্রায়শ স্নিগ্ধ অবজ্ঞা পেয়েছে। আর অনুরূপভাবে তেরো শতকে বাংলায় তুর্কি বিজয় ঘটলেও বাঙালি মুসলমান কবি ও ইসলামি রচনাপ্রসঙ্গের সুদীর্ঘ সংলগ্ন ধারাটির যথাযথ পরিচয়ও এসব সংকলনে নেই।

চতুর্থত পূর্ববর্তী সংকলনসমূহে কবিতার সামাজিক-ঐতিহাসিক ভূমিকাটিকে সদর্পে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে। অথচ বাঙালির রাষ্ট্রচিন্তা এবং জাতীয়-ভাবনার বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা কবিতা ঘনিষ্ঠভাবেই জড়িত। এরই প্রতিক্রিয়ায় কবিতারচনার বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও বিচিত্র প্রকরণ থাকা সত্ত্বেও এই সংকলনগুলিতে মধুররস অনাবশ্যক প্রাধান্য পেয়েছে এবং কেবল লিরিকের আঙ্গিকটিই যোগ্য ব'লে বিবেচিত হয়ে এসেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যেহেতু শেষ পর্যন্ত অনান্দনিক তাই কবিতালগ্ন বা কবিতার সমান্তরাল অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে মিলটুকুও সেক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

মধ্যযুগের নানা বাংলা পুঁথি এবং বিভিন্ন মুদ্রিত বইয়ে একই শব্দের নানা বানান দেখা যায়। পাঠকদের সুবিধের জন্য সংকলনটিতে মোটামুটি বানানের সমতা রক্ষা করা হয়েছে। কিছু দীর্ঘকবিতার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এবং কিছু কবিতার সংহত আকার এ সংকলনে ধরা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে উপনাম যোজনা করে অংশগুলিকে স্বাশ্রয়ীমূল্য দেবার চেষ্টা পাওয়া গেছে। অনুবাদ বাছাই করার সময় মূলানুগত্যের চেয়ে ভাষান্তরে প্রকাশিত যুগরুচিকে বেশি প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক এবং চর্যাগানের অনুবাদ আমার করা।

এ সংকলনটির যদি একান্তই কোনো মূল্য থাকে তবে তা একজন কবিতা-পাঠকের লোকায়ত সংগ্রহের মধ্যে শিল্পের মুক্তি খোঁজার ঘটনা থেকে এসেছে। যে সব শিক্ষক ছাত্র ও বন্ধুরা আমার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী এবং স্নিগ্ধ প্রেরণার সমর্থন জানিয়ে এসেছেন তাঁদের কাছে আমার ঋণের স্বীকৃতি পংক্তি মেপে দেবার নয়। এই সংকলন প্রকাশে সবধরনের সহায়তার জন্য বন্ধু শ্রীধীমান দাশগুপ্তর কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

বীতশোক ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

কবির নাম	ক্রমিকসংখ্যা
কৃষ্ণদেব	৫৫
রামাজ্ঞি পণ্ডিত	৫৬
রূপরাম চক্রবর্তী	৫৭
ঘনরাম চক্রবর্তী	৫৮—৬২
মানিকরাম গাঙ্গুলি	৬৩
রামকান্ত রায়	৬৪
রামরাজা	৬৫
রামেশ্বর ভট্টাচায	৬৬, ৬৭
রামানন্দ যতী	৬৮
মহম্মদ খাতের	৬৯
রাধাচরণ গোপ	৭০
ভারতচন্দ্র রায়	৭১—৭৬
রামপ্রসাদ সেন	৭৭—৮১
অজ্ঞাত	৮২
অজ্ঞাত	৮৩
শেখ ফয়জুল্লা	৮৪, ৮৫
অজ্ঞাত	৮৬
অজ্ঞাত	৮৭, ৮৮
অজ্ঞাত	৮৯—৯২
জালালউদ্দী	৯৩
লালু-নন্দলাল	৯৪
রাম বসু	৯৫
নিধুবাবু	৯৬
লালন ফকির	৯৭
অজ্ঞাত	৯৮
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৯৯—১০১
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১০২
মধুসূদন দত্ত	১০৩—১১৩
বিহারীলাল চক্রবর্তী	১১৪, ১১৫
দীনবন্ধু মিত্র	১১৬

১ ঢেঁকির মন্ত্র ॥ ব্রতের গান

ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উনান জ্বলন্ত।
আলো ধানে কালো পুতে
জনম যেন যায় এয়োতে ॥

২ উষা ॥ খনার বচন

ডাকয়ে পাখী না ছাড়ে বাসা।
উড়িয়ে বৈসে যাবে হেন আশা ॥
ফিরে যায় বাসে না পায় দিশা।
খনা ডেকে বলে সেই সে উষা ॥

৩ চর্যাগান-৬/হরিণশিকার ॥ ভুসুকু

কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেটিল ডাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুকু অহেরী ॥
তিণ চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী ॥
হরিণা বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।
এ বণ চ্ছাড়ী হোহু ভান্তো।
তরঙ্গন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঈ ॥

জাল ছেয়ে এলো, ডাক আসে চারদিকে ;
কেন, কাকে চেয়ে, খোলামেলা ব'সে আছো ?
ভুসুকু কখনো ছাড়ে কী শিকারটিকে !

নিজে হরিণের শত্রু হরিণ আজ ও।

জল খায় না ও, দাঁত বসায় না ঘাসে।
ভুসুকু বলছেঃ বোকা বুকে ঢোকে না তা,
হরিণী, সে বলেঃ হরিণ, হরিণ, কথা
শোনো, ভুলে বন ছেড়ে চলে যাও তুমি।
আর ঢেউয়ে ঢেউয়ে হরিণেব খুর মেশে।

হরিণ জানে না হরিণীব বাসভূমি ॥

৪ চর্যাগান-৪৯/জলদস্যুতা

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ ॥
আজি ভূসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালে লেলী ॥
ডহি জো পঞ্চ ধাটণ ইন্দি বিসআ ণঠা।
ণ জাণমি চিঅ মোব কহিঁ গই পইঠা ॥
সোণ রুঅ মোব কিম্পি ণ থাকিউ।
নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ ॥
চউ কোড়ি ভণ্ডাব মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥

এখন পদ্মার খালে ক্রমাগত ঢুকে যায় বজ্র-নৌবহর,
একদল জলদস্যু, লুঠেরা ও দাঙ্গাবাজ, এসেছে. নির্দয়
এ পঞ্চপাটন দেয় একেবাবে দাহ ক'রে, পোড়ে দেশঘর
ইন্দ্রের সমান রাজ্য। জানি না কোথায় গিয়ে এবার হৃদয়

উদ্বাস্তু, প্রবিষ্ট হবে। আমার সোনা ও রুপো কিছু রাখে নি তো।
নিঃশেষে লুণ্ঠিত কবে হয়ে গেছে চতুষ্কোটি মূল্যের ভাণ্ডার।
আহা, ছিল এক দিন মহাসুখ পরিবারে। আজ জীবন্মৃত।
কেবল ভুসুকু বলেঃ চণ্ডালিনী বাঙালিনী ঘরণী আমার।

৫ চর্যাগান-২০/মৃতবৎসা ॥ কুক্কুরী

হাঁউ নিবাসী খমণ সাঙ্গেঁ ।
মোহোব বিগোআ কহণ ন জাই ॥
ফেটলিউ গো মাএ অন্তউড়ি চাহি ।
জা এথু চাহাম সো এথু নাহি ॥
পহিল বিআণ মোব বাসনযূড ।
নাড়ি বিআবন্তে সেব বাযূড়া ॥
জাণ জোবন মোব ভইলেসি পূবা ।
মূল নখলি বাপ সংঘাবা ॥
ভণথি কুক্কুবীপা এ ভব থিবা ।
জো এথু বুঝএ সো এথু বীবা ॥

আমি আশাহীন, বসে আছি উপবাসী ।
সে আমাব স্বামী, ভর্তা সে, ক্ষপণক ,
সর্বস্বান্ত ঃ সে কথা অনর্থক ।
বোঝা যায় যে কী আসঙ্গপ্রত্যাশী ।
প্রসব কবেছি, খুঁজি গর্ভেব ফুল ,
কোথায আঁতড়ি ঃ না, না, সে তো নেই, না ।
বিদীর্ণ কবি, বাসনা, মাগো ও মা,
সম্পুট খুলে উড়ে গেছে, আমি ভুল
ক বে চাই, আরো আমাব পবাণ চায ,
নবীন বয়স, আজ হয়ে যায় পুবো ,
কই ক্ষপণক, খনক, যে খন্তায
তুলে দিয়েছিল বপন-বীজেব গূঢ
সঞ্চিত ধন—এখনো এখানে তবে
স্থিব হতে হবে, প্রভু, তবু বলা হবে !

৬ প্রকীর্ণ চর্যা ॥ কাহ্নু

বামে দাহিণে গুম ঘাট।
ভণই কাহ্নু অন্তরালেঁ বাট ॥

বাঁ-পাশে গুল্মের দিকে ছায়া টেনে নেয় এক সৈনিকশিবিরে ;
দক্ষিণে ঘাটের কাছে স্নিগ্ধ এক ঘাঁটি আছে শুল্কসংগ্রহের ;
এসব সমস্ত জেনে কিন্তু তবু কেন কাহ্নু ভণিতা করেছে ঃ
এসো, এসো, আছে পথ ; পথ আছে মধ্যবর্তী, ভিতরে যাবার।

৭ চর্যাগান-১৯/ডোমনীবিবাহ

ভবনিব্বাণে পড়হ-মাদলা।
মণ পবণ বেণি করণ্ড কসালা ॥
জঅ জঅ দুংদুহি সাদ্ উচ্ছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বীবিবাহে চলিলা ॥
ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আনুণুতু ধাম ॥
অহিণিসি সুরঅ পসংগে জাঅ।
জোইণিজালে রঅণি পোহাঅ ॥
ডোম্বীএর সঙ্গে জো জোই রত্তো।
খণহ ণ ছাড়অ সহজ উন্মত্তো ॥

ভব হে, নির্বাণ······
পটহ মাদলে ডাক উঠে ফেটে পড়ে।
ঝরে পড়ে পুষ্পদল, আর ওই উচ্ছল
বাজে কাড়া, ঝন্‌ন্‌ন্ কাংস্যকরতাল,
ও মন, পবন······
জোকার জেগেছে আজ, ওই যে ডিমডিম—
বিবাহে চলিলা হ্যাখো কাহ্ন ডোমনিকে।

হাওয়া যাতে না হয় সে অবধূতী বধূ—
যামিনীতে দ্বার ভাঙো, আর অমনি জয়জয় ওঠে।
আর কী অযুক্ত আছে যৌতুক তোমার ঃ
রজনী পোহাও তুমি যোগিনীপ্রবাহে আহা যোগিনীর জালে শুয়ে ব'সে
সারারাত রশ্মি এসে পড়ে, সারাদিন
সুরতপ্রসঙ্গে যায়, অনুরাগী যেই পায় জ্ঞানমুদ্রা তার
সহজ উন্মাদ আর কিছুতেই আনন্দের আধার ছাড়ে না
ক্ষণকাল।

৮ চর্যাগান-২৮/শবরশবরী ॥ শবর

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরি।
ণিঅ ঘরণী ণামে সহর্জ সুন্দারী ॥
ণা ণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধাবী ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেম্থ রাতি পোহাইলি ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণেঁ।
একে শরসন্ধাণেঁ বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥
উমত সবরো গুরু আস রোষে।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ ॥

শবরী, ময়ূরপুচ্ছ পরেছে সে, গুঞ্জামালা দোলানো গ্রীবাতে ;
অত্যুচ্চ পাহাড়ে হাঁটে, চূড়ান্তের পারে পারে আস্তীর্ণ গগন ঃ
অগণ্য তরুর ফুল, ঊর্ধ্বশাখ তবু আরো, দূর-ছোঁওয়া বন
শূন্যতা-সমৃদ্ধ রাখে ঃ এ দৃশ্য, সময় শুধু অন্বেষণে কাটে

একেশ্বরী শবরীর , আলো ওঠে থেকে থেকে সতেজে ঝিকিয়ে
কানের কুণ্ডলে, বজ্রে ঃ সহজসুন্দরী ও যে, কবিস নে গোল ;
ও শবব, প্রেমিকপ্রবর ওবে, ও তো তোরই, যা নিয়ে পাগল ;
উন্মাদ, যা দোহাই, তা-ই শবরীকে নিয়ে যা রে তোব গৃহে ।

খুব মহাসুখ তোর, খুব মহাসুখে তুই পাতিস শয্যাটি ,
আচ্ছন্ন করিস যেন, ত্রিধাতুব খাটখানি জাগে তার নিচে ,
মহাসুখে রাত্রি কাটে ঃ তুই সে প্রেমিক, আব নৈরামণি যে
ও রমণী, তাই বুঝি তাম্বুলে-কর্পূরে ভোর, তা হলে প্রভাতী
তোর গুরুরোষ কেন উন্মত্ত শবর, তুই একান্ত পরম
একবাণে জিনে নিবি, শিগরসন্ধিতে ঢুকে ভ্রম হবে কম !

৯ চর্যাগান-৫০/মত্তশবরমৃত্যু

গঅণত গঅণর্ত্ত তইলা বাড়্হী হেঞ্চে কুরাঢী ।
কণ্ঠেঁ নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥
ছাড়ু ছাড মাআ-মোহা বিষমী দুন্দোলী ।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী ॥
হেরি যে মেরি তইলা বাডী খঃসমে সমতুলা ।
যুকড এসে রে কপাসু ফুটিলা ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি তাএলা ।
ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা ।
অণুদিণ শবরো কিংপি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥
চারি বাসে গড়িল রে দিআঁ চঞ্চালী ।
তংহি তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দ শগুণ শিআলি ॥
মারিল ভবমত্তা রে দহ-দিহে দিধলি বলী ।
হের সে সবরো নিরেবণ ভঈলা ফিটিলি অব সলী ॥

এই বধদণ্ড তোর, তাই বয়ে নিয়ে যাবি হৃদয়ে কুঠার
আবদ্ধ, এবং বাঁধা পড়ে আছে কণ্ঠে তোর নৈরামণি মেয়ে :

শবর, তৃতীয় বাড়ি গগনে গগনে ছায় ; ওই এক গেহে
তোদের নিবাস, দৃঢ়, টিলার উপরে, তুই মহাসুখী, আর
জ্যোৎস্নায় ফিনিক ফোটে ঠিক ও বাড়ির পাশে, অন্ধকারহীন ;
খ-সম তৃতীয় বাড়ি, কাপাস প্রস্ফুট কতো, ফোটে কাংনিদানা—
অদ্ভুত আসব হয়, শবর-শবরী মত্ত, খেয়াল রাখে না
কোথায় কী হতে থাকে, আকাশকুসুমে মাতে কেমন বিপিন।

তাই কোজাগরী ভালো, শূন্য মেয়েমহলেতে বিষম বিলাস :
শবর কী খুশি হতে? মায়ামোহ ছেড়ে যায়, দাহের সময়
তাকে তুলে ধরা হলো, চাঁচাড়ির আস্তরণ আর চার বাঁশ
এবার পেতেছে শয্যা, সে পোড়ে প্রমত্ত, যতো দশদিশময়
আশ্চর্য ছড়ায় পিণ্ড, কাণ্ড এভাবেই হলো—শবর নির্মূল,
শেয়াল-শকুনি কাঁদে, তবে তার দুঃখ দূর এই ভুল ভুল!

১০ একটি প্রকীর্ণ চর্যা

অপুব্ব বসন্ত দুকেল্লা শবরো অম্বর ফলই ফুল্লই।
তোড়িঅ হাথেন চাহিঅই বিরহে কেলি করেই ॥

আকাশ ফল। আকাশ ফুল।
শবর কিছু ছিঁড়ে ও
ফেলে না ; খেলে। ফাগুনদিন।
শবর, তোর বিরহ ॥

১১ গীতগোবিন্দম্/প্রথম শ্লোক ॥ জয়দেব

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈর্
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥

জমেছে মেঘের পরে মেঘ।
তমালের ছায়া বন ঢাকে।
অন্ধকার, ভয় লাগে ওর।
রাধা, তুমি ওকে ঘরে নাও।—
নন্দের কথায় তারা যায়
পার হয়ে বিতানের গাছ,
আব শেষে রাধামাধবের
নিহিত কামের জয় হয়
যমুনার নদীতীরে এসে॥

১২ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন/বড়ায়ীবুড়ী ॥ বড়ু চণ্ডীদাস

শেত চামর সম কেশে।
কপাল ভাঙ্গিল দুঈ পাশে॥
ভ্রূহি চুনবেথ যেহ্ন দেখি।
কোটর বাটুল দুঈ আখি॥
মাহা পুট নাশা দণ্ডহীনে।
উন্নত গণ্ড কপোল খীনে॥
বিকট দন্ত কপট বাণী।
ওঠ আধর উঠক জিনী॥
কাঠি সম বাহুযুগলে।
নাভিমূলে দুই কুচ লুলে॥
কুটিল গমন ঘন কাশে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

১৩ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন/রাধাকৃষ্ণসংবাদ

তাম্বুল নেহ আইহনের রাণী।
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী॥
তাম্বুল দিআঁ মোরে কি বোলসি।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী॥

সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী॥
তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ।
তাকে হাথে করি দুধ না আউটোঁ॥
ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাত মজিল মন আহ্মারে॥
মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে॥

১৪ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন/রাধাবিরহ

ফুটিল কদমফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাডিআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবো শঙ্খচুর॥
কাহ্ন বিণী সব খন পোড়এ পবাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআ॥
জেঠ মাস গেল আষাঢ় পরবেশ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ॥

১৫ গোপালবিজয়/গোকুল ত্যাগ ॥ দৈবকীনন্দন সিংহ

রাত্তি-শেষে গোকুলে উঠিল কোলাহল।
কেহ কারো নাম ধরি চিৎকারে ত্বরায়।
কেহ গালি দেই ষে মুখে বাহিরায়॥

কেহ শিকা রঙ্গে, কেহ শকট সজ্জা করে।
কেহ ভারিজনকে ডাকে উচ্চস্বরে ॥
কেহ ত ঘরের সজ্জা সাজায়ে বান্ধিয়া।
কেহ ত কোলের শিশু ভুঞ্জায় রান্ধিয়া ॥
কেহ পিঠে শিশু নিল কাপড়ে বান্ধিয়া।
কেহ কেহ আগে সজ্জা দিল পাঠাইয়া ॥
কেহ ত রন্ধন করে, শিকাতে তোলে ভাতে।
কেহ কেহ কোলের শিশু লইল ত্বরিতে ॥
কেহ কেহ শিশু লইল কাপড়ে জড়িয়া।
কেহ শিশু লয়্যা যায় আঙ্গুলে ধরিয়া ॥
কারো কারো নিজ নারী আগুসরি যায়।
তার বাপা ঝাঁপি লয়্যা পশ্চাতে গোডায় ॥
কাবো কারো নারী যায় শকটে চড়িয়া।
আশেপাশে শুধি করে অঙ্গুলি দেখাইয়া ॥
কারো নারী পুত্র যায় বলদে চডিয়া।
কতো নারীগণ যায় একমেলি হইয়া ॥
যেখানে কাহ্নাঞি যায় বৎসগণ পিছে।
সব গোপীগণ যায় তার পাছে পাছে ॥

১৬ গোপালবিজয়/পুতনা রাক্ষসী

পুতনা দেখিতে সব লোকের হুড়াহুড়ি।
গোকুলে পডিয়াছে ছয় ক্রোশ জুডি ॥
এক ক্রোশ জুডি তার মাথার পাতনে।
লাঙ্গলের ঈষসম বিকট দশনে ॥
গিরিবর-কন্দর জিনি নাসাদণ্ড।
পর্বতের গুহা দেখিয়ে মুখখণ্ড ॥
অন্ধকূপ সম আঁখি দেখি ভয়ঙ্করে।
পখুরের রহি যেন নাভিব গভীরে ॥
ইক্ষুবন সম যার এ ভুরু যুগলে।
মরুস্থল সম উরু অতি ঘোরতরে ॥

স্তন দুই গোটা যেন সুমেরুশিখরে।
ঘোরতর উদর শুখান সরোবরে॥
গিরিনদী সমান দীঘল দুই হাতে।
খালিজুলি সমান অঙ্গুলি শোভে তাতে॥
জাঙ্গাল সমান জিহ্বা দেখিয়ে দীঘলে।
দেখিয়া সর্বাঙ্গ লোক ভয়ে বেয়াকুলে॥

১৭ পূর্বরাগ ॥ বিদ্যাপতি

যব গোধূলি-সময় বেলি
তব মন্দির-বাহির ভেলি।
নবজলধরে বিজুরী-রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি॥
সে যে অল্প-বয়স বালা
জনু গাঁথনি পুহপমালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল বাঢ়ল মদনজ্বালা॥
কিবা গোরী-কলেবর লোনা
জনু কাজরে উজর সোনা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি-খীন দুলহ লোচন-কোনা॥
চারু ঈষত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন-কোণে।
চিরজীবী রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভনে॥

১৮ প্রেমবেদনা ॥ অজ্ঞাত

হা হা প্রাণপ্রিয় সখী কিনা হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনু-মন জরে॥
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যাহাঁ গেলে কানু পাও তাহাঁ উড়ি জাও॥

১৯ আত্মনিবেদন ॥ চণ্ডীদাস

বঁধু কি আর বলিব আমি ।
জীবন মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি ।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলুঁ দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলুঁ এ তিন ভুবনে
আর কে আমার আছে ।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াইব কার কাছে ॥
এ-কুলে ও-কুলে দু-কুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায় ।
শীতল বলিয়া শরণ লইলুঁ
ও-দুটি কমল পায় ॥
না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর ।
ভাবিয়া দেখিলুঁ প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর ॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি হেরি
তবে সে পরাণে মরি ।
চণ্ডীদাস কয় পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি ॥

২০ রামায়ণ/রাজা—মুনির সন্তান বধের পর ॥ কৃত্তিবাস

ভূপতি ভাবেন, আসি মৃগ মারিবারে।
ঘটিল তপস্বিহত্যা আমার উপরে ॥
মৃতমুনি তুলি রাজা লইল কাঁধেতে।
অন্ধকের বনে গেল কান্দিতে কান্দিতে ॥
হেথা তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী।
বামনেত্র ভুজস্পন্দে অমঙ্গল দেখি ॥
গৃহিণী বলেন, নাথ, একি কুলক্ষণ।
আজি কেন পুত্রের বিলম্ব এতক্ষণ ॥
অন্ধক বলেন, শুন, পাগলিনী নারী।
আর দিন নিকটে পাইত ফল বারি ॥
আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন।
সেই হেতু বিলম্ব হইল এতক্ষণ ॥
এই কথাবার্তা তাঁরা কহেন দুজন।
মড়া কোলে করি রাজা গেলেন তখন ॥
শুষ্ক শ্রীফলের পাতা মচমচ করে।
অন্ধক বলেন, এই পুত্র এল ঘরে ॥

২১ রামায়ণ/অহল্যা উদ্ধারের পর

মুনি কহিলেন, বলি কৈবর্ত তোমারে।
গঙ্গায় করহ পার এ তিন জনারে ॥
কাতরে কৈবর্ত কহে করিয়া বিনয়।
নৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রময় ॥
তবে যদি আজ্ঞা মোরে কর তপোধন।
স্কন্ধে লয়ে করি পার যাহ তিনজন ॥
কোথা হতে আসিল এ পুরুষ সুন্দর।
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্রস্তর ॥
এ কথা শুনিয়া আমি সভয় অন্তর।
চরণধূলিতে মুক্ত হইল প্রস্তর ॥

নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধূলি।
কি দিয়া পুষিব আমি মম পোষ্যগুলি॥
করিবেক গৃহিণী আমারে গালাগালি।
বলিবে মুনির বোলে নৌকা হারাইলি॥
যদি বল শ্রীরামের চরণ ধোয়াই।
নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী হারাই॥

২২ রামায়ণ/রাম-সীতার বনগমন

দিবাকর কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা।
চলিতে কাতরা অতি জনক দুহিতা॥
হিঙ্গুল-মণ্ডিতা তাঁর পায়ের অঙ্গুলী।
আতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলী॥
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন।
দেখিতে আইল পথে মুনিপত্নীগণ॥
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি।
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী॥
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী।
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি॥
দূর্বাদলশ্যাম অগ্রে অতি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর॥
দেখি অতি মনোহর সুন্দর বদন।
ধনুর্বাণ করে উনি তোমার কে হন॥
নবীন কমল মুখ ভ্রূভঙ্গ-রচিত।
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকশিত॥
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি যে আমার॥

২৩ রামায়ণ/রাম ও জটায়ু

এরূপে শ্রীরাম ভ্রমেন চারিদিকে।
রক্তে রাঙ্গা জটায়ুকে দেখেন সম্মুখে॥
পক্ষীকে কহেন রাম করি অনুমান।
খাইলি সীতারে তুই বধি তোর প্রাণ॥
সন্ধান পূরেন রাম তারে মারিবারে।
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে ধীরে ধীরে॥
অন্বেষিয়া সীতারে পাইলে বহুক্লেশ।
এই দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ॥
সীতার লাগিয়া রাম আমাব মরণ।
সীতারে লইয়া লঙ্কা গেল সে বাবণ॥
দুই ভাই তোমরা নাহি ছিলে ঘর।
শূন্যঘব পাইয়া হরিল লঙ্কেশ্বর॥
আমি বৃদ্ধ যুদ্ধ করি রুদ্ধ কবি তায়।
রাখিয়াছিলাম রাম তোমার আশায়॥
দুই পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাবণ।
মুখে রক্ত উঠে বাম যায় এ জীবন॥
ইতস্ততঃ ভ্রমণে নাহিক প্রয়োজন।
চিন্তা কর রাম যাতে মরিবে রাবণ॥
তোমাব পিতার মিত্র তোমা লাগি মরি।
আপনি মাবিলে রাম কি করিতে পারি॥

২৪ রামায়ণ/সীতার অগ্নিপরীক্ষা

কেহ কিছু নাহি বলে স্তব্ধ সর্বজন।
ধীরে ধীরে কন সীতা মুছিয়া নয়ন॥
জনক-নৃপতি বংশে আমার জনম।
দশরথ শ্বশুর যে তুমি পতি মম॥
ভালমতে জান প্রভু আমারি প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি॥

সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইতব নারীর মত ভাব কি কারণ॥
হনূকে আমার কাছে পাঠালে যখন।
আমারে বর্জন কেন না কৈলে তখন॥
বিষ পান করিতাম অনলে প্রবেশ।
লঙ্কাব ভিতর এত না পেতাম ক্লেশ॥
কটক পাইল দুঃখ সাগরবন্ধনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে যে বণে॥
এতেক করিয়া কর আমারে বর্জন।
তুমি হেন স্বামী বর্জ বৃথায় জীবন॥
বেশ্যা নটী নহি আমি পবে কব দান।
সভা বিদ্যমানে কর এত অপমান॥
কৃপা কব লক্ষ্মণ এ কবহ প্রসাদ।
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘুচুক অপবাদ॥

২৫ শ্রীকৃষ্ণবিজয়/দৈত্যরাজের উদ্দেশে॥ মালাধর বসু

কি কব রণের কথা গড়াগড়ি বুলে মাথা
যতেক পডিল ক্ষিতিতলে।
কান্দে মুণ্ড জোড়াইয়া রাজাকে বুলে চাহিয়া
না পাইয়া বাণী ব্যাকুলে॥
মাংস রুধির পায়া শৃগালী বোলে ধাইয়া
হাড মাংস কডমড়ি খাএ।
কোথাহ সে কাকপাখি মডার সে খায় আঁখি
দেখিয়া সে নারী ত্রাস পাএ।
সাহস করিয়া রাণী মনে ভয় নাহি মানি
করিয়া অনেক পরবন্দ।
চিত্তের ঘুচায়া ধন্দ উকটএ কাটা কন্দ
রাজা পায়া বিষাদে আনন্দ॥
রাণী হৈল অচেতন রাজাকে দেই আলিঙ্গন
অবিরত করএ চুম্বন।

হা হা হের দৈবগতি ভূমিতলে দৈত্যপতি
পুষ্পশয্যা ছাড়িলে শয়ন ॥
যে তোমার প্রসাদে না দেখিল সূর্যচাঁদে
সে হেন আইলু এত দূর।
আপন বিক্রম বলে নাহি কর প্রতিফলে
কেন হৈয়া থাকিলে নিষ্ঠুর ॥
থাকে যবে মোর দোষ তবে কর অভিরোষ
শাস্তি দেহ করিয়া বিচার।
না দেহ উত্তর কেনি না দেখহ পাটরাণি
এ কোন্ রাজার ব্যবহার ॥

২৬ পদ্মাপুরাণ/লোহার বাসর গঠন ॥ বিজয় গুপ্ত

সকল কামার তবে হইলেক মেলা।
ভাগে ভাগে আনিলেক আঙ্গারের ছালা ॥
হাতোড হাতিনা তবে আনিল তখন।
সারি দিয়া কামার সব জ্বালিল দোকান ॥
দোকান জ্বালিয়া তবে কবে গণ্ডগোল।
কেহ বলে তাতা তাতা, কেহ বলে তোল ॥
অগ্নি হেন ছয় লোহা দেখিতে সুন্দর।
লড় দিয়া তোলে নিয়া নেহালির উপর ॥
হাতুড়ের বাড়ি সাড়াশির ঝনঝনি।
নাগিনী ফোফায়ে যেন হাতিনার শব্দ শুনি ॥
চতুরদিকে অগ্নিজ্বাল গায়ের পড়ে ঘাম।
কেহ ঘরের ভিটা বান্ধে, কেহ বান্ধে থাম ॥

২৭ পদ্মাপুরাণ/চাঁদসদাগরের কাঠ বিক্রি

হেতালবাড়ি হাতে চান্দো মন্দগতি যায়ে।
কাষ্ঠ লবা কাষ্ঠ লবা, ডাকে উচ্চরায়ে ॥

কাষ্ঠ লইয়া ফিরে চান্দ ক্ষুধিত নয়নে।
কুমারের বৌয়ারী তারে ডাকে হাতসানে॥
সহজে সুবোধ বড় কুমার বৌয়ারী।
চান্দের কাষ্ঠ কিনিল দিয়া পোন চারি॥
চান্দ বলে, বিধি মোরে হইল ভাল মন।
এক বোঝা কাষ্ঠ বেচিলাম চারি পোন॥
এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়াশুদ্ধি করিমু।
এক পোন দিয়া আমি চিড়া-কেলা খামু॥
এক পোন দিয়া আমি নটী নাচাইব।
এক পোন দিয়া আমি সোনকা ভেটিব॥
মন-কলা খায়ে চান্দো মনের হরিষে।
নাগরথে থাকি পদ্মা খলখলি হাসে॥

২৮ অশঙ্কিনী ॥ মুরারী গুপ্ত

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন-পুতলী করি লইলোঁ মোহনরূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণগোচরে।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥

২৯ চৈতন্যভাগবত/দুঃখীর দুঃখ দূর ॥ বৃন্দাবনদাস

কোনদিন নৃত্য করি বৈসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্বভক্তগণে ॥
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দনৃত্য হয়ে।
ততক্ষণ দুঃখী পুণ্যবতী জল বহে ॥
ক্ষণেকে দেখিযা নৃত্য সজল-নয়ানে।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি বহি আনে ॥
সারি করি চতুর্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন ॥
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
প্রতিদিন গঙ্গাজল কোন জনে আনে ?
শ্রীবাস বোলযে, প্রভু, দুঃখী বহি আনে।
প্রভু বোলে, সুখী তারে বোল সর্বজনে ॥
এ জনের দুঃখী নাম কভু যোগ্য নহে।
সর্বকাল সুখী হেন মোর চিত্তে লযে ॥
এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে ॥

৩০ চৈতন্যভাগবত/বৈকুণ্ঠ-কোটালের ভূমিকায় হরিদাস

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস ॥
মহা পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
দণ্ড হস্তে সভারে করয়ে সাবধান ॥
"আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥"
হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে।
"কে তুমি ? হেথায় কেনে ?" সভেই জিজ্ঞাসে ॥
হরিদাস বোলে, "আমি বৈকুণ্ঠ কোটাল।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল ॥

লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব অপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজ হও সাবধানে॥"
এত বলি দুই গোঁফ মোচড়ায় হাথে।
রড় দিয়া বুলে গুপ্ত মুরারির সাথে॥

৩১ গোধূলি ॥ বলরামদাস

চান্দমুখে দিয়া বেণু নাম লৈয়া সব ধেনু
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অনুসারে বেণুরব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজসুখে।
যে ধেনু যে বনে ছিল ফিরাইয়া একত্র কৈল
চালাইল গোকুলের মুখে॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন-বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোখুর রেণু
পথে চলে করি কত রঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা দিয়া ঘন
বলরামদাস চলু সঙ্গে॥

৩২ নিষ্ঠুর প্রেম ॥ জ্ঞানদাস

কান্দিতে না পাই বঁধু কান্দিতে না পাই।
নিশ্চয় মরিব তোমার চান্দমুখ চাই॥
শাশুড়ী-ননদীর কথা সহিতে না পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥

চোরের রমণী যেন ফুকারিতে নারে।
এমত রহিয়ে পাড়াপড়শীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলে নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥

৩৩ হিমাভিসার ॥ গোবিন্দদাস কবিরাজ

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ।
চৌদিকে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ।
জগজন শয়নে নয়ন বহুঁ ঝাঁপ॥
এ সহি হেরি চমক মোহে লাই।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥
পরিহরি তৈখনে সুখময় শেজ।
উচকুচকঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
কমলচরণ তুহিনে নাহি দলই।
কণ্টক-বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথ কি সন্দেহ।
কিয়ে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ॥

৩৪ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/শ্রীচৈতন্যের শৈশব ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ

আপনি চন্দন পরি পরেন ফুলমালা।
নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ চাল-কলা॥
ক্রোধে কন্যাগণ বলে, শুন হে নিমাঞি।
গ্রাম সম্বন্ধে হও তুমি আমা সবার ভাই॥
আমা সবার পক্ষে ইহা করিতে না জুয়ায়।
না লহ দেবতাসজ্জ না কর অন্যায়॥

প্রভু কহে, তোমা সবাকে দিল এই বর।
তোমা সবার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর ॥
পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধনধান্যবান্ '
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্ ॥
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ।
বাহিরে ভৎর্সনা করে করি মিথ্যা রোষ ॥
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইয়া।
তারে ডাকি প্রভু কহে সক্রোধ হইয়া ॥
যদি মোরে নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী।
বুড়া ভর্ত্তা হবে আব চারি চারি সতিনী ॥

৩৫ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/শ্রীচৈতন্যের আইন-অমান্য

তা সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি।
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি ॥
নগরে নগরে আজি করিমু কীর্ত্তন।
সন্ধ্যাকালে সবে কর নগরমণ্ডন ॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘবে ঘরে।
দেখি কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে ॥
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়।
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায় ॥
এইমত কীর্ত্তন কবি নগরে ভ্রমিলা।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবে কাজীর দ্বাবে গেলা ॥
তর্জন-গর্জন করে লোক করে কোলাহল।
গৌরচন্দ্র বল লোক প্রশ্রয় পাগল ॥
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে।
তর্জন-গর্জন শুনি না হয় বাহিরে ॥

৩৬ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/প্রেমতত্ত্ব

অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা॥
এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্যামৃত আস্বাদে সকলি॥
যদ্যপি নির্মল রাধার সৎপ্রেম দর্পণ।
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণ॥
আমার মাধুর্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে।
এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে॥
মন্মাধুর্য রাধার দোঁহে জোড় করি।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি॥
আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয়॥
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকাস্বরূপ হইতে তবে মন ধায়॥

৩৭ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত/বাউল শ্রীচৈতন্য

কৃষ্ণলীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল
গড়িয়াছে শুক কারিগর।
সেই কুণ্ডল কানে পরি তৃষ্ণালাউ থালি ধরি
আশাঝুলি স্কন্ধের উপর॥
চিন্তা কন্থা উড়ি গায় ধূলি বিভূতি মলিন কায়
হা হা কৃষ্ণ প্রলাপ উত্তর।
উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে লোভের ঝুলি নিজ মাথে
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর॥

মন কৃষ্ণ বিয়োগী দুঃখে মন হৈল যোগী
সে বিয়োগে দশ দশা হয়।
সে দশায় ব্যাকুল হৈয়া মন গেল পলাইয়া
শূন্য মোর শরীর আলয় ॥

৩৮ বিরহ ॥ শেখর

ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
গগন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘন-খর-শর-হন্তিয়া ॥
সখি হে, হামার দুখের নাহি ওর রে।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর রে ॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনী
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভনহু শেখর কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া ॥

৩৯ আত্মজিজ্ঞাসা ॥ চন্দ্রশেখর দাস

কপট চাতুরী চিতে জনমন ভুলাইতে
লইয়ে তোমার নামখানি।
দাঁড়াইয়ে সত্য পথে অসত্য যজিব তাথে
পরিণামে কি হবে না জানি ॥
ওহে নাথ, মো বড় অধম দুরাচার।
সাধু শাস্ত্র গুরু বাক্য না মানিলুঁ মুঞি ধিক
অতএ সে না দেখি উদ্ধার ॥

লোকে করে সত্যবুদ্ধি মোর নাহি নিজশুদ্ধি
উদার হইয়া লোকে ভাঁড়ি।
প্রেমভাব মোরে করে নিজগুণে তারা তরে
আপনি হইলুঁ ছোঁচ-হাড়ী॥
চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা-পারিষদ সঙ্গে সংকীর্ত্তন রসরঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব॥

৪০ চণ্ডীমঙ্গল/ভাঁড়ু দত্তের ভেট ॥ মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী

তর্জ্জন গর্জ্জন করি ভাঁড়ু যায় পথে
নিমিষেকে উত্তরিল নিজ আলয়েতে।
"হরি দত্তের বেটা হও জয় দত্তের নাতি
হাটে যদি বেচাও বীরের ঘোড়া হাতি।
তবে সে করিব বাস গুজরাট ধরা
পুনর্বার হাটে মাস বেচাও ফুল্লরা।"
অনুক্ষণ চিন্তে ভাঁড়ু বীরের বিপাক
রাজভেট কাঁচকলা নিল পুঁইশাক।
চুপড়ি ভরিয়া নিল কদলীর মোচা
স্ত্রীর বসন পরে ভূমে নাম্বে কোঁচা।
পাগখানি বান্ধে ভাঁড়ু নাহি ঢাকে কেশ
কেসাইয়ের তিলক পরি রঞ্জিত কৈল বেশ।
কৈফিতের পাঁজিখান নিল সাবধানে
হরি শ্রুতি করিয়া কলম গোঁজে কানে।
ভাঁড়ু দত্তের ছোট ভাই নাম তার শিবা
পঞ্চাশ বৎসরে তার নাহি হয় বিভা।
ভাঁড়ু দত্ত বলে, "ভাই দঢ় কর হিয়া
এবার মণ্ডলী পাইলে আগে তোমার বিভা।"
ছোট ভাই লইল ভেটের আয়োজন
ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত করিল গমন।

৪১ চণ্ডীমঙ্গল/পৌষ-ফাগুনের পালা

পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন।
তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ॥
হরিণ বদলে পাইল পুরাণ খোসলা।
উঠিতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥
বৃথা বনিতা জনম, বৃথা বনিতা জনম।
ধূলিভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন॥
নিদারুণ মাঘ মাসে সদাই কুজ্ঝটি।
আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটি॥
ফুল্লরার আছে যত কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কিনিতে তুলিতে নাহি শাক॥
নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস।
সর্বজন নিরামিষ করে উপবাস॥
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা।
খুদ সেরে বান্ধা দিল মাটিয়া পাথরা॥
ফুল্লরার আছে যত কর্মের ফল।
মাটিয়া পাথরা বিনে নাহি অন্য স্থল॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥
মধুমাসে মলয়মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুপান করে মকরন্দ॥
বনিতা পুরুষ অঙ্গ পীড়য়ে মদন।
আমার পীড়িত অঙ্গ উদর দহন॥

৪২ চণ্ডীমঙ্গল/সখীসংবাদ

সম্ভ্রমে ফুল্লরা গেল সইয়ের দুয়ার।
সেয়াড়ি ভেট দিয়া সইয়ে কৈল নমস্কার॥
আইস আইস, বলিয়া ডাকেন তাঁরে সই।
দেখিতে লাগয়ে সাধ এতদিন বই॥

বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা।
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা॥
শিরে তৈল দিয়া তাঁর বান্ধিল কবরী।
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী॥
আঁচল ভরিয়া সই দিল খইমুড়ি।
চাপিয়া বসিল দোঁহে চৌখণ্ডি পিঁড়ি॥
ফুল্লরা ছুকাঠা চালু মাগিল উধার।
কালি দিব, বল্যা সই কৈল অঙ্গীকার॥
আইসহ প্রাণের সই, বৈস গো বহিনি।
মোর মাথে গোটা কত দেখহ উকিনি॥
দুই সয়ে কথায় মজিয়া গেল চিত।
ভগবতী লইয়া কিছু শুনিব সঙ্গীত॥

৪৩ চণ্ডীমঙ্গল/নিদয়ার প্রসববেদনা

পূর্ণ হইল দশ মাস ইন্দ্রসুত গর্ভবাস
ভুঞ্জেন আপন কর্মফলে।
প্রসূতি মারুত নড়ে অনুক্ষণ ব্যথা বাড়ে
লোটায় নিদয়া মহীতলে॥
সখি স্কন্ধে দিয়া ভর আসে যায় বাড়িঘর
কেহ অঙ্গে দেয় তৈলপানি।
আনে কেহ প্রিয়সই মুখে তুলিয়া দেয় খই
নিদয়া প্রভুরে বলে বাণী॥
প্রাণনাথ, হেট হই, ধর মোর কেশ।
কেশমূলে পড়ে টান বেরায় আমার প্রাণ
কি করিব কোন উপদেশ॥
হইল উদর ভাবি বসিলে উঠিতে নারি
শুইলে ফিরাইতে নারি পাশ।
চাহিতে না পারি হেট সূচে যেন বিন্ধে পেট
দূর হইল জীবনের আশ॥

সংশয় জীনে আশা হইল মবণ দশা
বুকে পিঠে বিন্ধে যেন বাণ।
শত শঙ্কা আমি জায়া কেবল তোমাব দয়া
জীবনেব আমাব নিদান ॥

৪৪ চণ্ডীমঙ্গল/ঘুম পাড়ানি গান

আবে বাছা আয আয আয।
কি লাগে কান্দে মোব শ্রীমন্ত বায ॥
আনিব তুলিযা গগনফুল।
একেক ফুলেব লক্ষেক মূল ॥
সে ফুল গাঁথিযা পবাব হার।
সোনাব বাছা মোব না কান্দ আব ॥
গগনমণ্ডলে পাতিব ফাঁদ।
বান্ধিয়া দিব তোবে শবদ চাঁদ ॥
কপালে দিব তোব সে চাঁদ ফোঁটা।
খেলাতে দিব বাছা সোনাব ভেটা ॥
খাওয়াব ক্ষীবখণ্ড পবাব চুযা।
কর্পূব পাকা পান সবস গুয়া ॥
বথ তুবঙ্গ দন্তী যৌতুক দিয়া।
বাজার দুই কন্যা কবাব বিয়া ॥
শ্রীমন্ত চাপিবে বিনোদ নায়।
কস্তুবী কুমকুম চন্দন গায় ॥
সুখে নিদ্রা যান চামববায়।
শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দ গায ॥

৪৫ চণ্ডীমঙ্গল/গঞ্জনা

আব শুন্যাছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘবেব পো ঘরে আছে চাহেন হাটে মাঠে ॥

হিয়ায় কাপড় নাহি দেয়, আতুড় মাথার কেশ।
নগর চাতরে ফিরে বারবনিতার বেশ॥
বারেক আসুক সাধু কহিব সন্ধান।
পাট পড়শী আয়ো সুয়ো হইও পরমান॥
না মানে দমন ছুঁড়ি না মানে দোহাই।
ষাঁড় চায়্যা বুলে যেন বাথানিয়া গাই॥
ব্যাজ দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
মন্দিরে থাকিলে পতি নাকে দিত পদ॥
ঐ যুবতী ঐ পুতন্তী এহার হয়েছে বেটা।
দ্বন্দ্বকন্দলে সদাই মোরে দেয় বাঁজের খোঁটা॥
দু বহিনে দু সতিনে থাকি একু বাসে।
আঁখির তারা পুত্রহারা মোরে না জিজ্ঞাসে॥
নগরচাতরে ফিরে কেহ নাহি সঙ্গে।
পো চাহিবার ব্যাজে ছুঁড়ি আছে ভাল রঙ্গে॥
সইয়ের সঙ্গে যত করে গঞ্জন লহনা।
কাঁথের আড়ে থাকি সকল শুনেন খুল্লনা॥

৪৬ চণ্ডীমঙ্গল/সতিনকাঁটা

কান্দে শীলা রাজার নন্দিনী।
আকুল কুন্তলভার না জানে পড়িল হার
স্বামীরে গঞ্জিয়া বলে বাণী॥
জন্ম হইল সুখস্থলে ছিনু মা বাপের কোলে
নাহি জানি দুঃখের বারতা।
প্রথম বয়সে দুখ ধরণ না যায় বুক
কোন দোষে দিলে মোরে সতা॥
ভাই বন্ধু মাতা পিতা যেবা মোর আছে যথা
সব ছাড়ি গোড়াইলাম তোমারে।
আমি যত কৈল ক্ষেম তুমি দূর কৈলে প্রেম
দুই কুল নহিল শীলারে॥

তোমার যতেক ভাষ কেবল বাগুরা ফাঁস
ঘাটি আহিড়ীর যেন রীত।
হাম মৃগী ক্ষীণবলা না বুঝি তোমার ছলা
যত বৈলে সব বিপরীত॥
চিরকাল থাক জিয়া আর কর সাত বিয়া
লীলা মাগে সিংহলে বিদায়।
বলি প্রভু শুন কাম অন্তরে নহিবে বাম
সাজন করিয়া দেহ নায়॥

৪৭ চণ্ডীমঙ্গল/জলখেলা

শঙ্খ বাজে জোড়া সানি চৌদিগে মঙ্গলধ্বনি
জলখেলা করে বামাগণ।
হরিদ্রা কুমকুম আনি তাহে মিশাইয়া পানি
কুলবধূজনের ব্যসন॥
চারি পাঁচ বধূ সনে লহনারে ধর‍্যা আনে
অঙ্গে তার দেই কাদা জল।
লীলাবতী বাষ্যা যায় আইয ধর‍্যা আনে তায়
দুবলা হাসেন খলখল॥
কেহ হাসে কেহ গায় কেহ গড়াগড়ি যায়
কেহ নাচে দিয়া করতালি।
কেহ বা লুকায় কোলে কেহ তারে ধর‍্যা তোলে
শিরে তার দেই জল ঢালি॥
পূর্ব্বের হাব্যাসে বুড়ি ধরিয়া বেতের নড়ি
গায় নাচে গড়াগড়ি যায়।
সাধুর ভাণ্ডার লোটে আন্যা ঘৃত দধি ঘটে
ঢালিয়া কর্দম খেলে তায়॥
সাত পাঁচ সখি বেড়ি ধরিয়া দুবলা চেড়ি
বিবসন করিয়া নাচায়।
জলখেলা সাঙ্গ করি চলে সবে ঘরাঘরি
সাধুস্থানে নানা ধন পায়॥

৪৮ চণ্ডীমঙ্গল/ঝড়ের মুখে

কাণ্ডার ভাই, রাখ ডিঙ্গা যেথা পাও স্থল।
ঐরি হইল দেবরাজ বেঙতড়কা পড়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল।
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক বারেক জীবন রাখ
নাহি জানি কিবা গ্রহফল
নাহি জানি দিবা রাতি ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি
ঝলকে ঝলকে লয় জল।
শিল বাজে যেন গুলি ভাঙ্গিল মাথার খুলি
বেগে জল যেন বাজে কাঁড
বিষম জলের ভয় ঝড়ে প্রাণ স্থির নয়
ডাঁডিয়া ধরিতে নারে ডাঁড়।
দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া গাছ পাড়ে
দুকূল হানিয়া বয় খানা
আটমুখে বহে বায়ু পর্বতসমান ঢেউ
রাশি বাশি কত বহে ফেনা।
দেখ রে ডিঙ্গার পাশে মকর কুম্ভীর ভাসে
গিবিগুহা বিকট-দশন
বিষম জলের ভয় তৃণ দুইখান হয়
আজি দেখি সঙ্কট জীবন।

৪৯ মহাভারত/অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ॥ কাশীরাম দেব

হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া কহিল, রহ রহ যাজ্ঞসেনী॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ, সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি॥

বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য, কেমনে বিন্ধিল ॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্নসহ যত দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে, দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জুন বীর বলেন বচন ॥
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ॥
সর্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয় ॥
এত বলি অর্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পুরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর ॥

৫০ মনসামঙ্গল/নারিকেল ॥ কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

রাজা বলে, নরমুণ্ডপ্রায় কিবা ওটা।
সাধু বলে, সুমধুর নারিকেল গোটা ॥
স্বাদু বলকারী ইহা দেবভোগ্য ফল।
ভিতরে সুমিষ্ট শাঁস সুমধুর জল ॥
রাজা বলে, বিষফল আমি বাসি মনে।
একটা খাওয়াও কাকে মম বিদ্যমানে ॥
সাধু দেয় নারিকেল এক বেটার হাতে।
সুমিষ্ট করিয়া জ্ঞান কামড়ায় দাঁতে ॥
যত কামড়ায় তত লাগে উৎপাত।
কামড়ের চোটে ভাঙ্গে গোটা তিন দাঁত ॥
হাঁ করিয়া রহে বেটা করয়ে চীৎকার।
সভাসদ্ যত সবে করে হাহাকার ॥

৫১ মনসামঙ্গল/লখিন্দরের প্রাণদান

লখিন্দরে বেড়ি দিল কাপড় কাণ্ডার।
সম্মুখে রাখিল দেবী অস্থি-র ভাণ্ডার॥
যেখানে যা লাগে তার অস্থি প্রতিখানি।
পদ্মহস্ত দিয়া দেবী জোড়েন আপনি॥
মুখমণ্ডল নয়ন হইল দুই শ্রুতি।
হস্ত পদ হৈল তার সুগঠন মূর্তি॥
ধড়ে প্রাণ নাহি যেন চিত্রের পুত্তলি।
মনসা ঝাড়েন তারে মহামন্ত্র বলি॥
কি কর শিমুলডালি ধুকরিয়া কঙ্ক।
মোর পুত্রে হইয়াছে সাপিনীর ডঙ্ক॥
সাপিনী ধরিয়া খাও, বিষহরি বলে।
কঙ্ক স্মরণে বিষ ধিকিধিকি উলে॥
হাড় মাংস রক্তে বিষ হাড়ে কর বাসা।
খেদাড়িয়া দেহ বিষ বলেন মনসা॥
বিষেরে বিষম ডাক দিল মত্ত শিখী।
ময়ূর স্মরণে বিষ নামে ধিকি ধিকি॥
বেজি বলে, আয় বিষ, তোরে আমি কাটি।
কালিনীর কালকূট মোরে দেহ ভাটি॥
পাতিয়া যুগল কর মাগেন গরল।
মনসার মন্ত্রে বিষ ফুঁকে হইল জল॥
লখাই নির্বিষ হইল মনে মনে জানি।
তবে মন্ত্র মনে কৈল মৃতসঞ্জীবনী॥

৫২ মনসামঙ্গল/মেলানির ভার

বেহুলা বলেন, শুন, সুন্দর লখাই।
তোমারে লইয়া যবে জলে ভেসে যাই॥
মেলানির ভার লইয়া তিন সহোদর।
আমা লৈতে এসেছিল করিয়া আদর॥

ফিরিয়া গেলেন তাঁরা আমার এ বোলে।
মেলানির ভার পোঁতা আছে চাঁপাতলে॥
পূর্ব কথা মনে ভাল হইল আমার।
আছে কিনা আছে দেখি মেলানির ভার॥
কোদালি করিয়া মাটি কাটিল কাণ্ডারী।
নানা দ্রব্য তোলে তার বেহুলা সুন্দরী॥
চিপিটক মুড়কি আর উত্তম সন্দেশ।
রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ॥
ডাগর ঝালের নাড়ু চিনি-চাঁপাকলা।
গর্ভ হইতে নানা দ্রব্য তুলিল বেহুলা॥

৫৩ সতী ময়না/মাটি ॥ দৌলৎ কাজি

সিদ্ধি পদ পুণ্য পদ পৃথিবীতে সব।
মৃত্তিকা সে রাজধানী সকল সম্ভব॥
মাটি হতে রত্ন মণি রূপের প্রতিমা।
সৃজিয়া প্রকাশে বিধি আপন মহিমা॥
পরম হংসের খেলা মাটির পাঞ্জর।
মাটি ভঙ্গে হংসরাজ গতি শূন্যান্তর॥
মাটি হতে ভেদ পায় শূন্য চলাচল।
ছোট বড় রঙ্গ যত মাটিতে সকল॥
নানা রঙ্গে কেলি খেলা উপজে বিলাস।
মৃত্তিকায় ভোগ পুন মৃত্তিকা গরাস॥
কে বুঝিবে মাটি মর্ম পরম সংশয়।
হাসি খেলি যত ইতি মাটিতে মিশয়॥
মাটি দেখি মাটি ভুলে মাটি মহামায়া।
মাটি শূন্য, স্থিতি মাটি, মাটি যুক্ত কায়া॥

৫৪ অভিসার ॥ আলাওল

ননদিনী রস বিনোদিনী,
ও তোর কু-বোল সহিতাম নাবি।
ঘরের ঘরিনী জগত মোহিনী
প্রত্যূষে যমুনাএ গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পববেশ
কিসে বিলম্ব করিলি ॥
প্রত্যূষে বেহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবাবে গেলাম।
বেলা উদনে কমল মৃদনে
ভোমবা দংশনে মৈলাম ॥
কমল কণ্টকে বিষম সঙ্কটে
কবের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল ॥
শীষেব সিন্দূর নয়ানেব কাজল
সব ভাসি গেল জলে।
হেব দেখ মোরে অঙ্গ জর জব
দারুণি পদ্মের নালে ॥
কুলের কামিনী কুলেব নিছনি
কুলে নাই তোব সীমা।
আরতি মাগনে আলাওলে ভণে
জগত মোহিনী রামা ॥

৫৫ মহাভারত/ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ ॥ কৃষ্ণদেব

হা ভায়ি, মা।
শত ও তনয় মোহি তেজি কহু গেল,
কয়ল নাক পয়ান।

বিফল ভেল এবে হমর জনম।
নহি জায়ি আছ মোর প্রাণ॥
সুয়োধন জীবন অধার॥
বুঢ় বয়স হমে পাবল শোক
হরি হরি কে করত ত্রাণ।
করম লিখন ফল দুর নহি জায়
জয় ভূপতীন্দ্রনৃপভান॥

৫৬ শূন্যপুরাণ/নিরঞ্জনের রুষ্মা॥ রামাঞি পণ্ডিত

যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হইল মহামদ বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল কাজী কার্তিক হইল গাজী
ফকির হইল যত মুনি॥
ত্যেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা।
চন্দ্র সূয আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সবে মিলি বাজায় বাজনা॥
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তিঁহ হইল হায়া বিবি
পদ্মাবতী হইল বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ করিল দারুণ পণ
প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দোহারা ভাঙ্গে কাড়্যা-কুড়্যা খায় রঙ্গে
'পাকড়, পাকড়,' বলে বোল।
ধরিয়া ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
এ বড় বিষম গণ্ডগোল॥

৫৭ ধর্মমঙ্গল/গুরু-শিষ্য ॥ রূপরাম চক্রবর্ত্তী

শনিবারে ধর্মের কারণে হৈল দেরি।
দৈবহেতু সেদিন মাঘের টীকা পড়ি ॥
গুরুর সম্মুখে বসিয়া পাঠ চাই।
পূর্বপক্ষ শুনাইতে গুরুকে ডরাই ॥
সমাস টীকার হেতু বাড়িল জঞ্জাল।
পূর্বপক্ষ ধরিতে বিধাতা হৈল কাল ॥
এত শুনি গুরু হৈল পাবকের ধার।
পূর্বপক্ষ পরম ধরিল তিনবার ॥
ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।
ক্রোধ করি নিষ্ঠুর বলেন উর্দ্ধ-রায় ॥
গোটা দুই অক্ষর পড়াতে যায় দিন।
পড়াবার বেলা হই ইহার অধীন ॥
বিশাশয় পড়ুয়া থাকে মোর মুখ চায়্যা।
দুই প্রহর বেলা যায় ইহার লাগিয়া।
গোটা চারি অক্ষর অনন্ত বর্ণ কয়।
সদাই পাঠের বেলা জঞ্জাল লাগায়।
পড়াতে নারিল তোরে যাহ নিজ ঘর।
নহে নবদ্বীপ যাহ কিবা শান্তিপুর ॥
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।
বিটঙ্ক মুখের শোভা বসন্তের চিনা ॥
এমন বচন শুনি মনে লাগে ডর।
সূর্যের সমান গুরু পরম সুন্দর ॥

৫৮ ধর্মমঙ্গল/মা-বাবা-ভাই-বোন ॥ ঘনরাম চক্রবর্ত্তী

ঘরের বারতা পাত্র জিজ্ঞাসিল আগে।
রঞ্জাবতী ভগ্নী বলি ডাকেন সোহাগে ॥
ক্ষণে ক্ষণে সেখানে মনের হতো তাপ।
আইবড় ভগিনী ভবনে বৃদ্ধ বাপ ॥

জীবন জুড়াল দেখি জননী জনকে।
বুনের বিবাহ আমি দিব তুই একে॥
রঞ্জার বিবাহ ভয়ে কেহ নাহি বলে।
শুনিলে সহসা পাত্র কোপে পাছে জ্বলে॥
বৃদ্ধা রাণী বলে বাছা ছিলে নাই ঘরে।
রাজা বিভা দিল তার কর্ণসেন বরে॥
দক্ষিণ ময়না কোথা সেথা করে বাস।
শুনি হেঁটমুখে পাত্র ছাড়িল নিশ্বাস॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠি বলে হায় হায়।
এ তাপ বাপের পুত্রে সহা নাহি যায়॥
মাথায় উঠেছে গিয়া চরণের জুতা।
কার বুদ্ধে বাবা এত পেয়েছ লঘুতা॥
ভাল মোর কপালে কলঙ্ক লেখা ছিল।
প্রিয় ভগ্নী রঞ্জাবতী আজ হতে মলো॥

৫৯ ধর্মমঙ্গল/কালু ডোমের মদ্যপান

পুনরপি শুঁড়িবাড়ি লাগাইয়া লেঠা।
আরে তারে যেয়ে বলে মদ দে রে বেটা॥
মদ নাই বলিতে নিষেধ নাহি মানে।
দেদে দেদে দেদে বেটা দেদে বলি টানে॥
হাঁহা হাঁহা করিতে হাঁফালে ঢোকে বাড়ি।
তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় সব শুঁড়ি॥
ধেয়ে যেয়ে তরাসে শুঁড়িনে মাগে কোল।
দৌড়রে দৌড়রে দড় ওঠে গণ্ডগোল॥
কি কি বলি ধায় লখে ডোমনী চঞ্চল।
শুঁড়ি বলে বীর কালু জেতে করে বল॥
চুপ চুপ বলিয়া ডোমে ধরিল ডোমনী।
বীর বলে ছেড়ে দেরে হেদে রে ঢেমনী॥
কাঁচলী কচটে করে মুখে পিয়ে মধু।
লাজ পেয়ে পালায় শুঁড়ির বেটি বধূ॥

কোলে নিল প্রাণনাথে বান্ধি ভুজপাশে।
লঘুগতি এলো রামা আপনার বাসে॥
গালে গলে গরল গোঙ্গানী গায়ে তাপ।
লখে বলে কেন ওহে শাকাশুখার বাপ॥
মুখে নাহি উত্তর উত্তরে পড়ে ঢুলে।
কাঁদে লখে কপালে কঙ্কণ হানে ভুলে॥

৬০ ধর্মমঙ্গল/বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ

কোপে বাঘবর করিছে গর্‌গর্‌
ফর্‌ফর্‌ কবিয়া গুম্ফ।
কড়মড় দন্ত করে বেগবন্ত
ডুবন্ত মাবিছে লম্ফ॥
তবে বীববর বায়ে কবি ভর
ফলঙ্গে লঙ্ঘিল তায়।
ফিবি ফলা সাবি হুঙ্কারে হাঁকারি
হটে চোট হানে বায়॥
চমৎকার চোটে লম্ফ মারি উঠে
দাপটে না টুটে বল।
কোপে তাপে লাফে থাবা মারি ঝাঁপে
লাউসেনে কামদল॥
ঘালি খেয়ে তায় ঘায়ের জ্বালায়
ঘুবে ঘুরে পড়ে ধোঁকে।
ভর করি বায় তেড়ে আসে বায়
ফলা হানে তার বুকে॥
লোটাইয়া লেজ হলো হত তেজ
নখে অবনী আঁচড়ে।
বিপদনাশিনী তখন তারিণী
দেবী তার মনে পড়ে॥

৬১ ধর্মমঙ্গল/যুদ্ধের পর

বিশেষ শুনিল সবে যতজন মৈল।
নিজ নিজ শোকে সবে সমাকুল হৈল॥
কিবা ছোট বউড়ী ঝিউড়ী বুড়ী ঠাড়ী।
ধূলায় লোটায়ে কান্দে শিরে ভাঙ্গে হাঁড়ী॥
প্রমাদ পড়িল বড় ডোমের পাড়ায়।
গড়াগড়ি দিয়া সবে কান্দে উভরায়॥
কেহ বলে কোথা গেল অভাগীর বাছা।
করিল স্বপন সত্য সাক্ষী পেনু সাঁচা॥
কেহ খোঁড়ে কপাল কঙ্কণ হানে শিরে।
অবনী ভিজিল কারো নয়ানের নীরে॥
হরে ডোমের বেটী কান্দে নিরা ডোমের বউ।
বীরা ডোমেব বুন কান্দে শোকে হৈয়া জউ।
হীরা জিরা দু সতীনে করে অনুতাপ।
কেমন করে কাটা গেল কূড়া চূড়ার বাপ॥
রমণী ডোমনী কাঁদে পত্নী রহিল।
সাজান তাম্বুল প্রাণনাথে নাহি দিল॥
এইরূপে কান্দে সবে করে হায় হায়।
চকিত চমকে লখে শত্রু বুক পায়॥
সবারে প্রবোধ করে কি কারণে কাঁদ।
যে কিছু হবার হোল সবে বুক বাঁধ॥

৬২ ধর্মমঙ্গল/চোরের নিছুটিমন্ত্র

বর পেয়ে অভয়ে আনিল ইন্দুরমাটী।
মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁধকাঠি॥
জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ্ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ্ নিদ্রা ঘোর॥
আগম ডাকিনীতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ রে নিছুটি॥

লাগ্ লাগ্ নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ্ ।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীরভাগ ॥
খাটে বাটে ভূমে পড়ে যেজন ঘুমায় ।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায় ॥
শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে ।
ঘোর নিদ্রা নিদুটি নয়নে তার লাগে ॥
চৌকিতে প্রহরী জাগে আগে লাগে তায় ।
কাঙ্গুরে কামিক্ষাদেবী চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥
মাটি পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই ।
উড়াইতে শহরে সবার উঠে হাই ॥

৬৩ ধর্মমঙ্গল/বাংলায় বন্যা ॥ মানিকরাম গাঙ্গুলি

যাবত সমুদ্র জল একঠাঞি জড় ।
টলবল রসাতল টিকে নাঞি গৌড় ॥
ঘরে ঘরে সবাকার প্রবেশিল বান ।
রাশিরাশি ভেসে গেল কত চাল ধান ॥
গণ্ডার মহিষ কত গরু পালে পাল ।
ছাগল গাড়র ভাসে কুকুর শৃগাল ॥
ব্রাহ্মণের বেদ ভাসে বৈষ্ণবের মালা ।
তামুলীর ভেসে গেল তামুকের ছালা ॥
কামারের জাঁতা ভাসে কুমারের হাঁড়ি ।
পাট পাট ভেসে যায় পোদ্দারের কড়ি ॥
দেউল দেহারে ভাসে দেবতার খাট ।
তাঁত ভাসে তাঁতির ধোবার ভাসে পাট ॥
কার বা শশুর ভাসে কার ভাসে পতি ।
কোলের কুমার ভাসে কান্দয়ে যুবতী ॥
বুড়ি করে হায় হায় বুড়া যায় ভেসে ।
লোচন থাকিতে বলে তারা যায় খসে ॥

পিতা মাতা ভেসে যায় পুত্র কান্দে শোকে।
কত বাঁডি ভেসে গেল চরখা দিয়া বুকে॥
মঞ্চে বসে মহারাজা মহাবানী সঙ্গে।
মহামদ ভেসে যায় মহৎ তরঙ্গে॥

৬৪ ধর্মমঙ্গল/বেকার কবি ॥ রামকান্ত রায়

দিনে দিনে অধিক হইনু উচাটন।
প্রবৃত্তি না দেয় কিসে বিচলিত মন॥
ধডফড করে প্রাণ অন্তব বিকল।
কভু ভাবি মনেতে যাইব নীলাচল॥
দিবানিশি শয়নে স্বপনে দেখি কত।
দিন কুডি উচাটন সয় এই মত॥
কাহারে না বলি কিছু অন্তর গুমবে।
সাবাদিন বেডাই সবার ঘবে ঘবে॥
বহুদিন ডানি বাহু ডানি চক্ষু নাচে।
ইচ্ছা নাই বচন কহিতে কার আছে॥
নিদ্রা নাই শয়নে শর্ববী জাগরণে।
উষ্মা হয় যদি কিছু বলে কোন জনে॥

৬৫ মৃগলুব্ধ সংবাদ/মৃগীর প্রতি পাশবদ্ধ মৃগের উক্তি ॥ রামরাজা

একদৃষ্টে চাহ মোরে নয়ান ভরিয়া।
সর্বক্ষণ মনে করি থাকিতে বসিয়া॥
মৈল হেন করি মোরে না ছাড়িঅ দয়া।
গোঞাইও অনেক কাল আম্মারে ভাবিয়া॥
মরিবারে কিছু চিন্তা নাহি মোর মনে।
তোম্মার সঙ্গে দিমু প্রাণ না থাকিমু এই স্থানে॥
জখনে তোম্মার সঙ্গে হৈল দরশন।
প্রাণ জুডাইতে মোরে দেয় আলিঙ্গন॥

লাড়িতে না পারি গাও দারুণ বন্ধনে।
তোম্মার আলিঙ্গনে প্রাণ জুড়াউক এখনে ॥
চন্দ্রের সমান মুখ দীঘল নয়ান।
হেন পুণ্য না কৈলু মুঞি দেখিতে সর্বক্ষণ ॥

৬৬ শিবায়ন/গৌরীর শঙ্খপরার সাধ ॥ রামেশ্বর ভট্টাচার্য

প্রণমিয়া পার্বতী প্রভুর পদতলে।
বঙ্কিণী সে রঙ্কনাথে শঙ্খ দিতে বলে ॥
দুঃখিনীর হাতে শঙ্খ দেহ দুটি বাই।
কৃপাকর কান্ত আর কিছু চাই নাই ॥
লজ্জায় লোকের কাছে দাণ্ডাইয়া রই।
হাত নাড়া দিয়া বাড়া কথা নাই কই ॥
তুল ডাটি পারা দুটি হস্ত দেখ মোর।
শঙ্খ দিলে প্রভুর পুণ্যের নাহি ওর ॥
পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে।
তখন তুলিয়া তাঁরে ত্রিলোচন বলে ॥
শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসুতা।
অভাগার ঘরে এক অসম্ভব কথা ॥
অর্থ আছে আমার আপনি যদি জান।
স্বতন্তরা বটে শঙ্খ পর নাই কেন ॥
বুড়া বৃষ বেচিলে বিপত্তি হবে ঘোর।
সেই বিনা সম্ভাবনা কিছু নাই মোর ॥
ভিখারির ভার্যা হৈয়া ভূষণের সাধ।
কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ ॥
বাপ বটে বড লোক বল গিয়া তারে।
জঞ্জাল ঘুচুক যাও জনকের ঘরে ॥

৬৭ শিবায়ন/শস্যোৎপত্তি

আয়ুধের কটমটি জুয়ালের মাঝে।
হুঙ্কারে হাঁকারে ঘন মেঘ যেন গাজে॥
চৈত্র মাস গেল সব চাষ হৈল পূর্ণ।
মাঠ কর‍্যা মই দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ॥
উঁচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগ্‌ভ্রম॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার‍্যা সব ভূমি বাতে বুনে॥
ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজা পোড়া ছাড্যা।
কলমীর শাক খায়্যা উজাড়িল গাড্যা॥
ব্যর্থ নাই গেল বীজ বারাহিল ঘন।
হন হন করে ধান বলাহক যেন॥
সময়ে সড়কা তুল্যা মার‍্যা দিল খড।
তাতে বাতে পাটী পায়্যা লাগ্যা গেল গড॥
হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম॥
হাপুতের পুত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখ্যা রহিল পাসর‍্যা পরিজন॥
প্রাবৃট প্রবর্ত হৈল ইন্দ্র আল্য সাজ্যা।
যুবজন উপরে মদন উঠে গাজ্যা॥

৬৮ চণ্ডীমঙ্গল/কাব্য-সমালোচনা॥ রামানন্দ যতী

চণ্ডী যদি দেন দেখা তবে কি তা যায় লেখা
পাঁচালীর অমনি রচন।
বুদ্ধি নাই যার ঘটে তারা বলে, সত্য বটে
পথে চণ্ডী দিলা দরশন॥

এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতী।
অনেকের উপরোধ কেহ না করিও ক্রোধ
অনেক শিষ্টের অনুমতি ॥

৬৯ লায়লি মজনু/মজনুর চিঠি ॥ মহম্মদ খাতের

প্রাণ সমতুল্য তুমি প্রেয়সী আমার।
হামেহাল মাগি দোয়া দরগাতে আল্লার ॥
প্রেয়সী কেমনে তুমি আমারে ছাড়িয়া।
বাদশাবেটার তবে করিয়াছ বিয়া ॥
খুশি-খোশালিতে দোহে আছ একসঙ্গে।
হাসি-খেলা হামেহাল কর নানা রঙ্গে ॥
আল্লা-তালা তোমাদের রাখে মনসুখে।
নব প্রিয়া ঘরে লিয়া রহ সুখে দুখে ॥
আমিত পুরানা মোরে গিয়াছ ভুলিয়া।
তোমার পিরীতে আমি আছি বন্দী হৈয়া ॥
তোমাব আশকে আমি হইয়াছি বন্দী।
বিধি কৈল বনবাসী লোকে কৈল বাদী ॥
তোমার কথার মতে আছে খালি প্রাণ।
স্বর্গ মর্ত্য কোনোখানে নাহি দেয় স্থান ॥
কলম রোদন করে লিখিতে ইহায়।
দুঃখ দেখে মুখ চেপে কালি না যোগায় ॥
তুমি প্রাণ সমতুল্য কি লিখিব পাতি।
বাক্য নাহি সরে মুখে লেখা হৈল ইতি ॥

৭০ জঙ্গনামা/হাসন হোসেনের নিধনে ফতেমার শোক ॥ রাধাচরণ গোপ

ফাতেমা বলিল, শুন খোদার পয়গম্বর।
হত্যা দিব বাবা আমি তোমার উপর ॥

আগু পাছু পবাণ সবাব দিয়াছেন খোদায়।
আমাব ইমাম কেনে ধূলাতে লোটায় ॥
ধূলামাটি নাহি দেখিলাম বাছা সবাব গায়।
সে বাছা পড়িয়া আমার ধূলায় লোটায় ॥
শিব কেটে নিয়াছে বাছাব কন্ধ আছে পড়ে।
দস্ত কেটে ইজারবন্দ কেবা নিল কাড়ে ॥
বছুল বলেন, ফাতেমা অগো কান্দ কী কারণ।
কেবা বদ করিতে পাবে মাগো আল্লাব লেখন ॥
শুন বাবা মাবিআ, গোলামকে তুমি দিলে বাদশাই।
তাব বেটায় মাবিলে আমার ইমাম দুই ভাই ॥
বিবির কান্দনে কান্দে বনের পশুগণ।
চান্দ সুরজ কাম্পে আর আল্লাব আসন।

৭১ অন্নদামঙ্গল/ভিখারি শিব ॥ ভারতচন্দ্র রায়

যেখানে যেখানে হব অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান ॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল ব'লে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা ॥
কেহ বলে, ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে, বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥
কেহ বলে, জটা হৈতে বাব কব জল।
কেহ বলে, জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
কেহ বলে, ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে, ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥
কেহ বলে, নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুলফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল ॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই ॥
ও দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই ॥

৭২ অন্নদামঙ্গল/নারীদের পতিনিন্দা

আর রামা বলে, আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড দিদি হই ॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে, কি দিবি ব্যভার ॥
সুতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি ॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সবস বাখানে ॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে ॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্যঅলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার।
শাঁখা সোনা রাঙা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু ॥

৭৩ অন্নদামঙ্গল/পদ্মিনী

হেন কালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায় ॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
'ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্মসার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার ॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি ॥

তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া।
হের, আস, বলি তারে ডাক দিল জয়া॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে।
হেব, এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিলে অভাগীরে, কে আছে এমন॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥

৭৪ অন্নদামঙ্গল/রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ

বাণী বলে, মহারাজ, কি কব, কহিতে লাজ
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ॥
ঘবে আইবড মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহেব না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ দেখিবে নাতিব মুখ
এডাইলে ঝির বিয়াদায়॥
কি কহিব, হায় হায়, জলন্ত আগুন প্রায়
আইবড এত বড মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে লোকধর্ম কিসে রবে
দিনেক দেখিতে হয় চেয়ে॥
উচ্চ মাথা হৈল হেঁট বিদ্যার হয়েছে পেট
কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমনি আছিল গর্ব তেমনি হইল খর্ব
অহঙ্কারে গেলে ছারখারে॥
বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত টেলে॥

সদা মত্ত থাক রাগে কোন ভার নাহি লাগে
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আব ছার দোষগুণ কব কার
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥

৭৫ অন্নদামঙ্গল/পুষ্পময় কামদেব রচনা

পাতা কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে।
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু।
তার পাশে গড়ে বতি ফুলময় তনু ॥
গাঁথিয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥
তিলফুলে কৈল নাসা, অধর বান্ধুলী।
চাঁপাব কলিকা দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥
নয়ন সুন্দব কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গডিল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥
কনকচম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥
গডিল পারুলফুলে তূণ মনোহব।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর ॥

৭৬ অন্নদামঙ্গল/ধান

মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আস্থ বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে ॥
দলকচু ওড়কচু খিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা ॥
কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুঁদি।
গুয়া শালি হরিলেবু গুয়াথুবী সুঁদী ॥

ঘিশালী পোয়ালবিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরছড়ী চিনা ধলবার ॥
দাতুসাহি বাঁশফুল ছিলাট করুচি।
কেলে জিরা পদ্মরাজ দুধসার লুচি ॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলাভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশগজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে ॥
বাজাল মরীচশালী ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনিসমতুল ॥
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী।
কদমা কুসুমশালী মনোহর অতি ॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দনারগুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে ॥
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু ॥

৭৭ শাক্ত গান/উমার শৈশব ॥ রামপ্রসাদ সেন

গিরিবর, আর আমি পারি নে হে, প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন্যপান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা, ধরে দে ইহারে।
কাঁদিয়ে ফুলালে আঁখি, মলিন ও মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে?
আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে
আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর

গৌরীরে লইয়া কোলে করে।

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী,

মুকুর লইয়া দিল করে॥

৭৮ শাক্ত গান/ভক্তের আকূতি

আমি কি দুখেরে ডরাই?

দুখে দুখে জন্ম গেল, আর কত দুখ দেও, দেখি তাই।

আগে পাছে দুখ চলে মা, যদি কোনখানেতে যাই।

তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই।

আমি এমন বিষের কৃমি মাগো, বিষের বোঝা নিয়ে বেড়াই॥

প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, বোঝা নাবাও, ক্ষণেক জিরাই।

দেখ, সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে, আমি করি দুখের বড়াই॥

৭৯ শাক্ত গান/মনোদীক্ষা

মন রে, কৃষি কাজ জান না।

এমন মানব-জমিন রইলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা॥

কালীর নামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।

সে যে মুক্তকেশীর (মন রে আমার) শক্ত বেড়া,

তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥

অদ্য অব্দ-শতান্তে বা, বাজাপ্ত হবে জান না।

এখন আপন ভেবে (মন রে আমার) যতন ক'রে

চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥

গুরু রোপণ করেছেন বীজ, ভক্তি বারি তায় সেঁচ না।

ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে ডেকে নে না॥

৮০ আগমনী গান

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাবো না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না ॥
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়—
এবার মায়ে-ঝিয়ে করবো ঝগড়া, জামাই ব'লে মানবো না ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে, ঘরের ভাবনা ভাবে না ॥

৮১ শাক্ত গান/ভয়হারিণী মা

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ক্ষেমঙ্করী আমার রাজা।
চেন না আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি
অভয় পদের বই রে বোঝা।
ক্ষেমার খাসে আছি ব'সে, নাই মহলে শুকা হাজা।
দেখ বালি চাপা, সিকস্ত নদী,
তাতেও মহল আছে তাজা।
প্রসাদ বলে, শমন তুমি, ব'য়ে বেড়াও ভূতের বোঝা ।

৮২ শাক্ত গান ॥ অজ্ঞাত

চাই মা, আমি বড় হতে।
আমি আর পারি নে থাকতে বাঁধা আমার অহং শৃঙ্খলেতে।
ক্ষুদ্র খাঁচায় আর থাকা দায়, নীলাকাশ ঐ সম্মুখেতে—
যাহে নীলবরণী নৃত্য কর মা শশীসূর্য লয়ে হাতে ॥
ক্ষুদ্র অহমিকা আমার বদ্ধ মা তোমার মায়াতে,
এখন তোমার মায়া তুমি লও মা, আমি ছড়িয়ে পড়ি বিশ্বভূতে
অসীম অনন্ত তুমি পরিব্যাপ্ত এ বিশ্বেতে,
হয়ে তোমার পুত্র আমি ক্ষুদ্র, সন্তানের মা লজ্জা তাতে ॥

৮৩ গোরক্ষ-সংহিতা/কথা ছিল ॥ অজ্ঞাত

গুরু গোসাঞি,
হৃদয় না ছিল যখন
কথা ছিল মন।
নাভি না ছিল যখন
কথা ছিল পবন॥
রূপ না ছিল যখন
কথা ছিল শব্দ।
গগন না ছিল যখন
কথা বৈসে চন্দ্র॥

৮৪ গোরক্ষবিজয়/যোগিনীর প্রেম নিবেদন ॥ শেখ ফয়জুল্লা

আমি তোমা কহি দড় আমার বচন ধর
চল যোগী আমার যে বাড়ি।
এথাতে থাকিয়া যবে কোন জন দেখে তবে
ঝুলি কাঁথা সব নিব কাড়ি॥
আঞ্চলে ঢাকিয়া লিমু মণ্ডপেতে বাস দিমু
থাবরী ভরিয়া দিমু ভাত।
নিতি নিরামিষ্য খাই ব্রাহ্মণী যোগিনী হই
চল যোগী আমার বাসাত॥
আহ্মারে কাটিমু সুতি তুহ্মি যে বুনিবা ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি।
দিনে দিনে বেশ হইব সম্পত্তি বাড়িয়া যাইব
তবে যাইব কাঁথা আর ঝুলি॥
যখন সমাজে যাইবা মৈষ্য ঘটি মান্য পাইবা
কথা কৈবা দুই হাত নাড়ি।
নয়ানে নয়ানে চাহ ঠার দিয়া কথা কহ
চল যোগী আমার যে বাড়ি॥

৮৫ গোরক্ষবিজয়/ভীমরতি

নাচন্তি যে গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর।
কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোছন্দর ॥
নাট কর নটী তুমি কথা কহ ছলে।
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে ॥
বুড়া দেখি তুমি মোরে যাইতে চাহ ছলি।
বারে বারে ভক্তি কর গুরু হেন বলি ॥
বুড়া নএ আমি তরুণা কিসে লাগে।
শতেক তরুণা আনি দেয় মোর আগে ॥
দেখিবা বুড়ার বল ধরি যদি বলে।
দুই কুচ মদ্দিয়া তুলিয়া লৈমু কোলে ॥
কাঞ্চলি ফাড়িমু তোর খসামু কবরী।
আমার ঘরেতে আসি যাইতে চায় ফিরি ॥

৮৬ যোগীর গান/মানুষের জন্ম ॥ অজ্ঞাত

যখন জননীর উদরে ছিলাম হে কারাগারে
আহার দিয়া বাতাস দিতেন মোরে।
বাতাসে বাতাসে মিশে বাতাস চলিল নাশে
সব মিছে বাতাস হল পুঁজি।
সেই পুঁজি দৃঢ় করি অটল ফল ভক্ষণ করি
তৃষ্ণায় খাই নাহু গঙ্গার জল।
আহা কি বিধির ফল দেহ মধ্যে গঙ্গাজল
সেই জলে পরাণ শীতল।
এ জ্ঞানে প্রভুর দয়া সদা দেন পদছায়া
ছেলেরে পাঠাইয়া দিল ভবে,
এ ভব মাঝারে পড়ি ক্ষুধায়ে আকুল তরি
জননী সে চাহিল ফিরিয়া।
ফিরিয়া যে মা চাহিল কমলকোলে আশ্রয় দিল
দুগ্ধ দিল ছেলের বদনে।
অজ্ঞানে এমন জ্ঞান স্তন ধরি দুগ্ধ পান
কে শিখাল এসব সন্ধানে।

৮৭ গোপীচন্দ্রের গান/গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ॥ অজ্ঞাত

রাজা বলে, শোন মা জননী লক্ষ্মী রাই।
সন্ন্যাস যাবার বল, মা, সন্ন্যাস হৈয়া যাই ॥
পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ।
অদুনা পদুনা রাণীক সঙ্গে নিবার চাওঁ ॥
অদুনা পদুনা রাণীর ঘরকে দেখি বটবৃক্ষের ছায়া।
ছাড়ি যাইতে রঙ্গের জরুকে মোর বড় নাগে দয়া ॥
নালুয়া পত্নী কন্যা হালিয়া পড়ে বায়।
ষোল বৎসর হৈল, বিভার হরিদ্রা আছে গায় ॥
বিভাব হবিদ্রা আছে, বিভার আম ডালি।
কোন পবাণে মহারাজা আমি হব ভিক্ষাধারী।

৮৮ গোপীচন্দ্রের গান/গোলাম-ভাই

রাজা বলে, শোনেক রাণী, আমি বলি তোরে।
গোলাম না কইস, গোলাম না কইস, হয় মোর ছোট ভাই ॥
একে দুধে পালন কচ্ছে ময়নামতী মাই ॥
আমি দশ মাসে, রাণী, খেতুয়া দশ মাসে।
কাকে আঁটে কাকে না আঁটে নসিবের দোষে ॥
নসিবেতে ফলে ধন, শুকানে ডিঙ্গা চলে।
নসিব বিরোধ হৈলে নানা রোগে ধরে ॥
সাত বরণের গাভী থাক এক বরণের দুধ।
আমি হছি রাজার ছেইলা, ভাই কেনে অছুৎ ॥
এক ঝাড়ের বাঁশ, রাণী, নসিবেতে লেখা।
কেহ হয় ফুলের সাজি, কেহ হাড়ির ঝাঁটা ॥
একে ত ফুলের সাজি হাতে মাথে রয়।
ঝাড়ন হাড়ির ঝাঁটা হাট খোলা সামটায় ॥
খেতুক দিম রাজ্যভার, খেতুক দিম বাড়ি।
ভাই খেতুকে সঁপিয়া যাইম তোমা হেন সুন্দরী ॥

৮৯ প্রাচীনপূর্ববঙ্গগীতিকা/সুন্দরী মলুয়া : পূর্বরাগ ॥ অজ্ঞাত

ভিন্‌দেশী পুরুষে দেখি চান্দের মতন।
লাজরক্ত হইল কন্যার পর্‌থম যইবন ॥
পঞ্চ ভাইয়ের বউয়ে ডাইক্যা কয়, ননদিনী।
সন্ধ্যাকালে জলের ঘাটে একলা কেন তুমি ॥
আউলা ঝাউলা অঙ্গের বসন মাথার কেশ খুলা।
আইজ কেনে জলের ঘাটে গিয়াছিলা একেলা ॥
আধা কলসী ভরা দেখি আধা কলসী খালি।
আইজ যে দেখি ফুটা ফুল কাইল দেইখ্যাছি কলি ॥
হাইস্যা মলুয়া কয়, বউ, তোমরার যত কথা।
মোর লাইগ্যা তোমরার মনে আছে আপন ব্যথা ॥
আজ দুইপর কালে আমার অঙ্গের বড়ো জ্বালা।
সিনান করিতে ঘাটে গিয়াছিলাম একেলা ॥
জলের ঘাটে কদম গাছ কদমের সুবাস।
সেই সুবাসে কার না বল মন করে উদাস ॥
কাইল না যাইবাম্‌ আমি ঐ না কদমতল।
তোমরা সবে ঘাটে যাইবা ভইরা আনবা জল ॥

৯০ বাইদ্যা কন্যা মহুয়া/মহুয়া ও নদের চাঁদ

"আমার দুঃখের কথা তোমার জাইনা কিবা কাম।
স্রোতের শেওলা আইছি, ভাইস্যা যাইবাম ॥
মনের সুখে রইছ ঠাকুর, সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে কর ঘর সুখেতে বান্ধিয়া ॥"
"জল ভর সুন্দরী কন্যা, তোমার শানে বাঁধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি, আমি না কইরাছি বিয়া ॥
তোমার কথা শুইনা আমার ফাইট্যা যায় পরাণি।
চউখে দেইখ্যা কও না কথা, একবার আমি শুনি ॥"
"কঠিন তোমার মাতা পিতা, কঠিন তোমার প্রাণ।
এমন যইবন তোমার যায় অকারণ ॥

কঠিন তোমার মাতা পিতা, কঠিন তান্‌রার হিয়া।
এমন সুন্দর কুমাররে তান্‌রা না দিয়াছে বিয়া॥"
"কঠিন আমার পিতা মাতা, কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মতন নারী পাইলে করবাম্‌ আমি বিয়া॥"
"লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর, লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বাইন্ধ্যা, ঐনা, জলে ডুইব্যা মর॥"
"কোথায় পাইবাম্‌ কলসী কন্যা, কোথায় পাইবাম্‌ দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুইব্যা মরি॥"

৯১ বাইদ্যা কন্যা মহুয়া/অবসান

শুন শুন প্রাণপতি বলি যে তোমারে।
জন্মের মত বিদায় দেও তোমার মহুয়ারে॥
খাড়া থাকো বাইদ্যা বাপ আগে আমি মরি।
এই না বইল্যা সুন্দর কন্যা বইক্ষে মাইল ছুরি॥
ছুইট্যা আইস্যা নদ্যার চান্দ কন্যার বইক্ষে পড়ে।
পিষ্ঠেতে মাইল ছুরি কালা দেওয়া নিষ্ঠুরে॥
বইক্ষে বইক্ষে রক্তে রক্তে এক হইয়া গেল।
নদ্যাব চান্দ মহুয়া কন্যা বিদায় লইল॥
হুমরাব আদেশে তারা কব্বর কাটিল।
এক সঙ্গে দুই জনারে মাটি চাপা দিল॥
বিদায় হইল সব যত বাইদ্যার দল।
যে যাহার স্থানে গেল শূন্য সেই স্থল॥
রইল তথায় পালং সই সুখ দুঃখের সাথী।
কান্দিয়া পোহায় কন্যা যায় রে দিবারাতি॥
আঞ্চল ভইর‍্যা বনের ফুল কন্যা তুইল্যা আনে।
মনের গান গায় কন্যা বইস্যা সেই না বনে॥

৯২ শীলাদেবীর পালা/যৌবনবেদনা

কি হইল কি হইল রে সখী আমি বুঝিতে না পারি।
ফাঁপ্‌লা বেদনে আমার বুক হইল ভারি।
রে সখী, শুন শুন॥
নিলাজ অঙ্গ সে সখী বসন নাই ত গায়।
কি জানি কি অজানা গান আইজ মন কোকিলায় গায়।
রে সখী শুন, শুন॥
বাইন্ধ্যাছি না বাইন্ধ্যাছি কেশ কৈয়া দিবি মোরে।
পরভাতে জাগায়্যা দিবি আমি থাকলে ঘুমের ঘোরে।
রে সখী, লাজে মইরা যাই।
ফুল কেনে মৈলান হইল আর ঐ চাঁদ কেন মৈলান।
আবেতে ঘিরিয়া লইছে দেখ জমিন আশমান।
রে সখী, দেখ দেখ।
আইজ ভাইঙ্গা চুইর‍্যা নতুন কইরা ছুনিয়া গড়িল।
কোন বিধির গড়নে এমুন পরাণ কাইড়্যা নিল।
রে সখী, আমায় বইলা দে॥

৯৩ শ্যামের বাঁশি॥ জালালউদ্দী

আয় না রে ভাই শুনি অপরূপ রূপধ্বনি
ঝঙ্কারে বাজিছে দিনরজনী।
কে বাজায় কোথায় বসে চলো যাই তার উদ্দেশে
মন কান্দাইয়া সেই দেশে তারে চিননি॥
সকল রাস্তা বন্ধ করে চলো যাই অন্তঃপুরে
তরঙ্গে বাজিছে তাল তুলিয়ে রাগিণী।
শয়নে স্বপনে ঘুমে জাগরণে
নিত্য নিত্য আসে যায় একটি রঙ্গিণী॥
প্রেমে বাধ্য করে যে রেখেছে তারে
সে হইয়েছে এ সংসারে গুণমণি।

খেমটা খেয়ালে   আদ্ধা চৌতালে

নাগর নাগরী খেলে করে টানাটানি ॥

ঠুংরী ধামালে   সামালে সামালে

তিন তারে মিশিয়া বলে আলেক-রব্বানি।

জলালউদ্দী বলে   হৃদয় কমলে

বংমহালের কলের গান কেমনে শুনি ॥

৯৪ সখীসংবাদ ॥ লালু-নন্দলাল

হলো এই সুখোলাভো পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে ॥
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুবে দেখি পাতালো কত দূর।
শেষে এই হোলো, কাণ্ডারি পালালো তরণী লাগিলো ভাসিতে ॥
ধনোপ্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে শরণো লইলাম যাব
তবু তার মন পাওয়া সখি আমারে হলো ভার।
না পুরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, মিছে পরিবাদো জগতে ॥

৯৫ বিরহ ॥ রাম বসু

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি, বলি
আর বলা হোল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না ॥
—একে আবাব যৌবনকাল
তাহে কাল বসন্ত এলো।
এ সময় প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো ॥
যখন হাসি, হাসি সে আসি বলে।
সে হাসি দেখিয়ে ভাসি নয়নের জলে ॥
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে
মন চায় ধরিতে
লজ্জা বলে ছি, ছি ধোরো না ॥

৯৬ টপ্পা ॥ নিধুবাবু

১. নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন-মিলন ॥
আঁখিতে যে যত হেরে সকলি কি মনে ধরে।
যেই যাকে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন ॥

২. তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে ॥
আর কি সে রূপ ভুলি, প্রেম তুলি করে তুলি
হৃদয়ে লিখেছি রেখে অতি যতনে।
সবাই বলে আমারে, সে ভুলেছে ভুল তারে।
সে দিন ভুলিব তারে যে দিন লবে শমনে ॥

৯৭ বাউল গান ॥ লালন ফকির

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
ও এক পড়শি বসত করে ॥
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
আমি বাঞ্ছা করি,
দেখবো তারি
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে ॥
বলবো কি সেই পড়শির কথা
ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর,
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো,
আমার যম-যাতনা যেত দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

১. আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে।
বাজতে বাজতে চলল ডুলি
ডুলি গেল সেই কমলাপুলি।
কমলাপুলির টিয়েটা
সুয্যিমামার বিয়েটা।
আয় লবঙ্গ, হাটে যাই
গুয়া পান কিনে খাই।
একটা পান ফোঁপরা
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।

২. খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি।
আর কটা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি।

৩. আমপাতা জোড়া জোড়া
মারব চাবুক চড়ব ঘোড়া।
ওরে বিবি ফিরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।
পাগলা ঘোড়া ক্ষেপেছে
বন্দুক তুলে মেরেছে।
অলরাইট ভেরি গুড
পাঁউরুটি বিস্কুট।
মেম খায় কুট কুট
সাহেব বলে ভেরি গুড।

৯৯ নির্গুণ ঈশ্বর ॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কান ॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতেব পিতা হয়ে তুমি হলে কালা ॥
আবার কি কথা শুনি প্রকৃতির কাছে।
তোমাব নয়নে নাকি, দোষ ধরিয়াছে ॥
উঠ উঠ মিছে কেন বলি বারে বারে।
জেগে যে ঘুমায় তারে কে জাগাতে পারে ॥
শুনিলাম আর এক কথা ভয়ঙ্কর।
নিজে তুমি ভবকর, কিন্তু নাই কর ॥
আমায় দিয়াছ কব, কর তার লও।
করে লিখি তব গুণ, অনুকূল হও ॥
অভিধান অভিধান, রাখিয়াছে মুখ।
কিন্তু একি অসম্ভব, নাহি তব মুখ।
কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা হাবা-আত্মারাম ॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার তোমার ॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে উপাধি ধরেছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি ॥

১০০ খেজুর গাছ

পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।
কাঠ ফেটে উঠে রস যত কাট কাটে ॥
দেবের দুর্লভ ধন জীরণের ঘড়া।
এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়া ॥
সে জলের ভাল ধর্ম মর্ম তার গূঢ়।
স্বভাবের ক্রিয়াজালে জ্বালে হয় গুড় ॥

আমাদের ভাগ্যদোষ মিছে করি দ্বেষ।
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ॥
লোভ ভারী আবগারী যুক্ত করি কর।
এমন খেজুররসে বসাইল কর॥
মাশুল উশুল করে রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে যুড়ে॥
এ প্রকার সুখসেব্য আর নাহি আছে।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে॥
নূতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর।
পায়স পীযূষসম অতি প্রেমকর॥
দেখহ খেজুর গাছ কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে॥
যে তাহার মাথা কাটে তারে দেয় প্রাণ।
খেজুরের মাথি নানা গুণের নিধান॥

১০১ তামাক

তাম্রকূট তরু চারু দৃশ্যসুখ তায়।
সারি সারি বাতাসের সুরে সারি গায়॥
এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা ভার।
সেই জানে যে পেয়েছে তামাকের তার॥
শুকাইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়া।
ফুড়ুক ফুড়ুক টানি গুড়ুক করিয়া॥
শ্রম চিন্তা উভয়ের বিশ্রামের বাটী।
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উস্কিবার কাটী॥
বড় বড় সাহেবেরা করেতে ধরিয়া।
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া॥
ধূম্রপান আস্বাদন যে জন না পান।
বদন-সদনে দেন যুক্ত করি পান॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্যগুণে বেঁচে।
নাকে দিয়ে রাখে প্রাণ হ্যাঁচ হ্যাঁচ হেঁচে॥

বিশেষত ধনী লোক সার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে॥
আলবোলা বোলবোলা বৃদ্ধি খুব পায়া।
শীতকালে বন্ধু তার তাম্রকূট ভায়া॥
মোটাবুদ্ধি মোটাটান দুঃখী সব হাবা।
আমাদের ত্রাণকর্তা থেলো আর ডাবা॥
যে করে লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস।
মন খুলে হ'কৃ সেই গুড়ুকের দাস॥

১০২ কাঞ্চীকাবেরী/কৃষ্ণ অশ্বারোহী ও মানিক গোপালিনী ॥ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্যভাগে দাঁড়াইয়া গোপের কামিনী।
সিতাসিত মেঘমাঝে যেন সৌদামিনী॥
কালিয় পুরুষ প্রতি মন মজেছিল।
'তুমি আগে খাও,' বলি বাড়াইয়া দিল॥
পরশিছে গোপবালা আনন্দে বিভোলা।
কর উত্তোলনে উভ স্তুতনুর চোলা॥
শ্রীমুখের প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে রয়।
ধ্যান জ্ঞান মন প্রাণ করিল বিক্রয়॥
সামালিতে না পারিল, লজ্জা গেল দূরে।
পুলকিল তনুরুহ প্রণয় অঙ্কুরে॥
করে কর পরশে, হরষে মুগ্ধ মন।
মহীতলে পড়ে ক্ষীর তেজিয়া ভাজন॥

১০৩ মেঘনাদবধ-কাব্য : প্রথম সর্গ/আবাহন ॥ মধুসূদন দত্ত

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,

বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।
কে জানে মহিমা তব এ ভব মণ্ডলে?
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্যরত্নাকর কবি! তোমার পরশে,
সুচন্দন বৃক্ষ-শোভা বিষবৃক্ষ ধরে!
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে?
কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে
মূঢ়মতি, জননীর স্নেহ তার প্রতি
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

১০৪ দ্বিতীয় সর্গ/সন্ধ্যা

অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা
নলিনী; কূজনি পাখি পশিল কুলায়ে;
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হম্বা-রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী,
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।

আইলেন নিদ্রাদেবী ; ক্লান্ত শিশুকুল
জননীর ক্রোড-নীড়ে লভয়ে যেমতি
বিরাম, ভূ-চর সহ জলচর-আদি
দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা।

১০৫ তৃতীয় সর্গ/বীরাঙ্গনা প্রমীলা

রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী
প্রমীলা। কিরীট-ছটা কবরী-উপরি
হায় রে, শোভিল যথা কাদম্বিনী—শিরে
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা,
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা
বিবিধ রতনময় স্বর্ণসাবসনে।
নিষঙ্গের সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক তুলিল,
রবির পরিধি হেন ধাঁধিয়া নয়নে!
ঝকঝকি উরুদেশে (হায় রে, বর্তুল
যথা রম্ভা বন-আভা!) হৈমময় কোষে
শোভে খরশাণ অসি, দীর্ঘ শূল করে :
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!—
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে,
কিংবা শুম্ভ নিশুম্ভ, উন্মাদ বীবমদে।
ডাকিনি যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী
বড়বা নামেতে বামী—বাড়বাগ্নিশিখা!

১০৬ পঞ্চম সর্গ/দাম্পত্য প্রেম

প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি

নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখী-কুল। মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন!
উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্যকান্তমণি
সম এ পরাণ কান্তা; তুমি রবিচ্ছবি;
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার। নয়নতারা। মহার্হ রতন।
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,—

১০৭ নবম সর্গ/শোকযাত্রা

খুলিল পশ্চিমদ্বার অশনি-নিনাদে।
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে,
কৌষিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে।
রাজপথ পার্শ্বদ্বয়ে চলে সারি সারি।
নীরবে পতাকিকুল। সর্বাগ্রে দুন্দুভি
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে।
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে;
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে
মৃদু গতি, বাজে বাদ্য সকরুণ ক্বণে।
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে
নিরানন্দে রক্ষোদল। ঝক ঝক ঝকে
স্বর্ণবর্ম ধাঁধি আঁখি! রবিকরতেজে
শোভে হৈমধ্বজদণ্ড; শিরোমণি শিরে;
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে;
বিগলিত অশ্রুধারা, হায় রে, নয়নে!

১০৮ ব্রজাঙ্গনা কাব্য/প্রতিধ্বনি

কে তুমি শ্যামেরে ডাক রাধা যথা ডাকে—
হাহাকার রবে ?
কে তুমি, কোন যুবতী, ডাক এ বিরলে, সতি,
অনাথা রাধিকা যথা ডাকে গো মাধবে ?
অভয় হৃদয়ে তুমি কহ আসি মোরে—
কে না বাঁধা এ জগতে শ্যাম-প্রেম-ডোরে।

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ—
আকাশ নন্দিনি !
পর্বত গহন বনে বাস তব, বরাননে
সদা রঙ্গরসে তুমি রত, হে রঙ্গিণি !
নিবাকাবা ভাবতি, কে না জানে তোমারে ?
এসেছ কি কাঁদিতে গো লইয়া রাধারে ?

না উত্তবি মোবে, বামা, যাহা আমি বলি,
তাই তুমি বল ?
জানি পরিহাসে রত, রঙ্গিণি, তুমি সতত
কিন্তু আজি উচিত কি তোমাব এ ছল ?
মধু কহে, এই রীতি ধরে প্রতিধ্বনি,—
কাঁদ কাঁদে, হাস, হাসে, মাধববমণি !

১০৯ বীরাঙ্গনা কাব্য/নীলধ্বজের প্রতি জনা

বাজিছে রাজ-তোবণে রণবাদ্য আজি,
হ্রেষে অশ্ব, গর্জে গজ, উড়িছে আকাশে
রাজকেতু, মুহুর্মুহুঃ হুঙ্কারিছে মাতি
রণমদে রাজসৈন্য, —কিন্তু কোন্ হেতু ?
সাজিছ কি, নররাজ, যুঝিতে সদলে—
প্রবীর পুত্রের মৃত্যু প্রতিবিধিৎসিতে,—
নিবাইতে এ শোকাগ্নি ফাল্গুনির লোহে ?

এই তো সাজে তোমারে, ক্ষত্রমণি তুমি,
মহাবাহু! যাও বেগে গজরাজ যথা
যমদণ্ড সম শুণ্ড আস্ফালি নিনাদে!
টুট কিরীটীর গর্ব আজি রণস্থলে!
খণ্ডমুণ্ড তার আন শূল-দণ্ড-শিরে!
অন্যায় সমরে মূঢ় নাশিল বালকে;
নাশ, মহেষ্বাস, তারে! ভুলিব এ জ্বালা,
এ বিষম জ্বালা, দেব, ভুলিব সত্বরে!
জন্মে মৃত্যু;—বিধাতার এ বিধি জগতে!
ক্ষত্রকুল-রত্ন পুত্র প্রবীর সুমতি,
সম্মুখসমরে পড়ি, গেছে স্বর্গধামে—
কি কাজ বিলাপে, প্রভু? পাল, মহীপাল,
ক্ষত্রধর্ম, ক্ষত্রধর্ম সাধ ভুজবলে।
হায়, পাগলিনী জনা! তব সভামাঝে
নাচিছে নর্তকী আজি, গায়ক গাইছে,
উথলিছে বীণাধ্বনি! তব সিংহাসনে
বসিছে পুত্রহা রিপু—মিত্রোত্তম এবে!
সেবিছ যতনে তুমি অতিথি-রতনে।—
কি লজ্জা! দুঃখের কথা, হায়, কব কারে?

১১০ শ্যামা-পক্ষী

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জবিহারি
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাইস্ সুস্বরে?
ক মোরে, পূর্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি!
সঙ্গীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীত-ধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি?
কে ভাবে, হৃদয়ে তোর কি ভাব উথলে?—

কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুখের আঁধারে মজি গাইস্ বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভব-তলে?
মোহে গন্ধে গন্ধবস সহি হুতাশনে!

১১১ কবিগুরু দান্তে

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্তি নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিবণে
খেদায় তিমিব পুঞ্জে, হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে
অজ্ঞান! জনম তব পবম সুক্ষণে।
নব কবি-কুল-পিতা তুমি, মহামতি,
ব্রহ্মাণ্ডেব এ সুখণ্ডে। তোমার সেবনে
পরিহরি নিদ্রা, পুনঃ জাগিলা ভারতী।
দেবীব প্রসাদে তুমি পশিলা সাহসে
সে বিষম দ্বাব দিয়া, আঁধাব নবকে,
যে বিষম দ্বাব দিয়া, ত্যজি আশা, পশে
পাপীপ্রাণ, তুমি, সাধু, পশিলা পুলকে।
যশের আকাশ হতে কভু কি হে খসে
এ নক্ষত্র? কোন্ কীট কাটে এ কোরকে?

১১২ ভারত-ভূমি

"Italia! Italia! O tu cui feo la sorte,
Dono infelice di bellezza!"

Filicaia.

"কুক্ষণে তোরে লো, হায়, ইতালি! ইতালি!
এ দুখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?
হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণজলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
বিধাতা ? রতনসিঁথি গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী
(হা ধিক্ !) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্মতি !
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ ; সুধা তিত অতি ?

১১৩ পীড়িত সিংহ ও অন্যান্য পশু

অধিক-বয়স-ভরে হয়ে হীন-গতি,
সিংহ কৃশ অতি।
জনরব-রূপ স্রোতে,
ভাসাল ঘোষণা-পোতে,
এই কথা ;—"মৃগরাজ মগ্ন রাজকাজে ;
প্রজাবর্গ, রাজপুরে পূজ কুল-রাজে।"
প্রভু-ভক্তি-মদে মাতি
কুরঙ্গ, তুরঙ্গ, হাতী
করে করি রাজকর,
পালা মতে নিরন্তর,
গেলা চলি রাজ-নিকেতনে,
অতি হৃষ্ট মনে।

শৃগাল-কুলের পালা আসি উতরিল ;
কুল-মন্ত্রী সভা আহ্বানিল ;
কি ভেট, কি উপহার,
কি পানীয়, কি আহার—
এই লয়ে ঘোর তর্ক বিতর্ক হইল ।
হেন কালে আর মন্ত্রী সহাসে কহিল ;—
"তর্কের যে অলংকার তোমরা সকলে,—
এ বিশ্বে এ বিশ্ব-জনে বলে ;
কিন্তু কহ দেখি, শুনি, কেন স্থানে-স্থানে
বহুবিধ পদ-চিহ্ন রাজ-গৃহ পানে ?—
ফিবে যে আসিছে, তার চিহ্ন কে মুছিল ?"
চতুর যে সর্বদর্শী, বিপদের জালে
পদ তার পড়িতে পাবে কোন্ কালে ?

১১৪ মধ্যাহ্নসংগীত ॥ বিহারীলাল চক্রবর্তী

চরাচরব্যাপী অনন্ত আকাশে
প্রখর তপন ভায়,
দিগ্‌দিগন্ত উদাস মূরতি
উদার স্ফুরতি পায় ।
বিমল নীল নিথর শূন্য,
শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য ;
দূর—অতিদূর দু'পাখা ছড়িয়ে
শকুন ভাসিয়া যায় ।
স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তৃষায় কাতর, কঠোর মরুত
একটুও নাহি বায় ।

১১৫ প্রেমপ্রবাহিণী/নির্বাণ

কত অমা ত্রিযামায় ছাতের উপর,
সারা রাত কাটায়েছি বসি একেশ্বর।
তিমির সংঘাতে বিশ্ব গাঢ় ধ্বান্তময়,
দুই হস্ত দৃষ্টি নাহি প্রসারিত হয়।
যে দিকেতে চাই সব অন্ধতম কূপ,
যেন মহাপ্রলয়েব স্পষ্ট প্রতিরূপ।
যেন ধরাতল নেবে গেছে তলাতল,
অসীম তিমিরসিন্ধু রয়েছে কেবল।
যত দেখিতাম সেই ঘোর অন্ধকার,
উদিতো হৃদয়ে সব সংহার আকার।
লয়ে যেতো মন মোরে সঙ্গে সঙ্গে কোবে,
শূন্যময় তমোময় শ্মশানে কবরে।
বিষাদে আচ্ছন্ন সব সমাধির স্থান,
দেখিয়া বিস্ময়ে হত ব্যাকুল পরাণ।
যত ভাবিতাম মন করি সন্নিবেশ,
ততই জাগিত মনে সেই সব দেশ;
যে সবার চিহ্ন আব দেখা নাহি যায়,
যে সবার কোনো কথা কেহ না সুধায়,
পুরাণে কাহিনীমাত্র রয়েছে নির্দেশ,
ধরণীর গর্ভে মগ্ন ভগ্ন অবশেষ।

১১৬ মানিকপীর ॥ দীনবন্ধু মিত্র

কত কেরামৎ জান রে বান্দা, কত কেরামৎ জান,
মাঝ-দরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় ব'সে টান।
দুর্গির ছাওয়াল কাত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়,
আর পুজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল ক'রে দেয়।
রাত্তির বেলায় ভূতির ডরে ডরিয়ে ওঠে ছেলে,
আর ছুড়কো মেয়ে ঝম্‌কে ওঠে খসম কাছে এলে।

বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল,
কলজেতে ফুটচে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।
সায়েরে গিয়েছে স্বামী, হাব্‌লী আঁধার ক'রে,
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।
মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে,
খসম যদি থাকত কাছে রে পুঁচ্‌ত রুমাল দিয়ে।
পিঁড়েয় বসে কাঁদছে বিবি ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেছে ঠাসে, খসম খসম বলে।
ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে, মান্‌ষির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই পালা কল্লাম শেষ॥

১১৭ দশমহাবিদ্যা/মহাকালীর ব্রহ্মাণ্ড ॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হেন বেগে বিশ্ব ঘুরে নাহি ধরে কল্পনা।
ধূমকেতু ভীমগতি নহে তাব তুলনা॥
আপনার বেগে স্থির মেরুদণ্ড উপবি।
স্রোতরূপে খেলে তাহে বেগধারা লহরী॥
সচেতন অচেতন যত আছে নিখিলে।
কৃমি কীট প্রাণিকায়া জনমে সে কল্লোলে॥
বিশ্বরূপ প্রাণী জড় জন্মে যত সেখানে।
ঘোররূপা মহাকালী গ্রাসে মুখব্যাদানে॥
অঙ্গ হতে বেগে পুনঃ বেগ-ধারা বিহারে।
করাল বদনা কালী নৃত্য করে হুঙ্কারে॥

১১৮ বৃত্রসংহার/বৃত্রাসুর

ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীমভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুঁড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।

ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্নপ্রায়,—কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন, উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
উছলিল কত সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল,
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে চূর্ণরেণুপ্রায়।

১১৯ বৃত্রসংহার/দেবশিল্পী

দেখিলা আলোকে
ভীমবলী আখণ্ডল ধাতুস্তরমালা,
পাংশুল, পাটল, শুভ্র, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত,
বক্রগতি সর্পাকৃতি চৌদিকে ভেদিছে
মহী-দেহ, নানাবর্ণে রঞ্জিত তেমতি
যথা ঘনস্তর-দল নানা আভাময়
পশ্চিম গগনপ্রান্তে ভানুরশ্মি ধরি।
অগ্রসরি কিছু দূরে দেখিলা বাসব
অগ্নি প্রজ্বালন যন্ত্র—যেন বা আগ্নেয়
শৈলশ্রেণী, সারি সারি বদন প্রসারি
উগারে অনলবাশি ধাতুবাশি সহ।
মিশেছে যে সব যন্ত্রে বায়ু-প্রবাহক
বিশাল লৌহের নল শতদিক হতে—
জরায়ু সহিত যথা গর্ভিণী-জঠরে
গর্ভস্থ শিশুর নাড়ী মিলিত কৌশলে।
নলরাজি-অন্যমুখে প্রকাণ্ড ভীষণ
উঠিছে পড়িছে জাঁতা ধাতুবিনির্মিত,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি ছুটিছে পবন
কভু ধীরগতি, কভু ঘোরতর বেগে।
যন্ত্রমণ্ডলীর মাঝে বিপুল শরীর,
প্রসারিত বক্ষদেশ, বাহু লৌহবৎ,
দেবশিল্পী ঘুরাইছে চক্র লৌহময়;
ঘর্মাক্ত, ললাট-ঘর্ম মুছি বাম করে।

১২০ দেশলাই-এর স্তব

নমামি বিলাতি অগ্নি—দেশলাইরূপী,
চাঁচাছোলা দেহখানি, শিরে কালো টুপি !
যেন বা ডিপুটি খাঁটি একহারা চেহারা,
মাথায় শালের বিঁড়ে—রাগে প্রাণ ভরা ।
প্রণমামি অগ্নিশিখ শুভ্র দেশলাই,
সাহেব গোলাম তব, সাবাস বাদসাই !
সোনা টিন রূপা তামা বাঁধা তব গায়,
লাটের পকেটে ফেরো, লেডির ঝাঁপায় !
নমামি ফরফরশব্দ ফস্ফব-বেষ্টন,
ধনি-মানি-জ্ঞানি বন্ধু, কাঙ্গালের ধন !
সন্ধ্যার সোনার কাটি, জ্যোছনার ছবি,
সাবাস বিলাতি বুদ্ধি বাক্সে বাঁধা রবি ।
নমামি কলির দেব আগুনের শলা !
নমামি সুখর্বদেহ খড়কে মোমে গলা !
নমামি অনলযষ্টি অবনী-বিহারী,
দেশলাই, প্রণমামি অন্ধকারহারী !
তোর গুণে, দিয়াকাটি, মুগ্ধ জগজন !
প্রণমামি দেশলাই দেবের ইন্ধন !

১২১ স্বপ্নপ্রয়াণ/রসাতল ॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গম্ভীর পাতাল ! যথা কাল-রাত্রি করাল-বদনা
বিস্তারে একাধিপত্য ! শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণা
দিবা-নিশি ফাটি রোষে ; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমো-হস্ত এড়াইতে—প্রাণ যথা কালের কবল !
কোথা জল কোথা স্থল কোথা তল কোথা দিগ্বিদিক !
রসাতল-গভীর তিমির এক গ্রাসয়ে সকল !

দেখে যদি মর্ত্ত্য কেহ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, সে কি আর
আসে ফিরে্য ! আপাদমস্তক ঘুরি, টলিয়া চরণ
কণ্টকিয়া কেশজাল, বিস্ফারিয়া নয়ন-যুগল,
তমোগর্ভে তলাইয়া শেষ-পৃষ্ঠে লভে শেষ গতি।
দল-বল একত্র করিছে হেথা রসাতল-পতি।

১২২ ভারত-উদ্ধার/বাঙালির রণযাত্রা ॥ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"ভয় যদি নাই তবে চক্ষে জল কেন ?"
"প্রিয়া-মুখ না হেরিলে যাত্রা নাহি হয়,
যাত্রা-কালে নেত্র-জল বাঙ্গালী-কল্যাণ,
উদ্দেশ করিয়া যদি কোনো কাজে যাই
গৃহ ছাড়ি দুই পদ, কান্দিবারে হয়।"
"নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ,
নিতান্তই দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলু-ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া,
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।"—বিপিন সম্মত।
এই ভাব সে প্রভাতে প্রতি ঘরে ঘরে।
তাড়াতাড়ি স্নান করি বঙ্গবীরবৃন্দ
নাকে-মুখে গুঁজিলেন ভাতে ভাত দুটো।
কাঁপিতে কাঁপিতে, হায় আশ্বিনে যেমতি
শারদীয় মহোৎসবে অষ্টমী তিথিতে,
পূজার প্রাঙ্গণে পাঁঠা বদ্ধ যূপকাঠে
বিল্বপত্র চর্ব্বে, যবে ছেদক আসিতে
বিলম্ব করয়ে কিছু ; অথবা যেমন
মার্গশীর্ষে পরীক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
যাত্রা করি একে একে বীরশ্রেষ্ঠ যত
সভাগৃহে উপনীত হইলা সকলে।

১২৩ মেঘনা ॥ নবীনচন্দ্র সেন

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
মানব জীবন ?
অমনি চাঁদনি তলে, অমনি নীলাভ জলে,
অমনি মধুর স্রোতে সঙ্গীত মতন,
বহিয়া না যায় কেন মানব-জীবন ?
বাসন্তী চন্দ্রিমামাখা চারু নীলাম্বর
মধুরে কেমন
মিশিয়াছ অন্তুতীরে, মিশিয়াছ নীল নীরে
বঙ্কিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন
অনন্তের সহ এই মানবজীবন ?
মানব জীবনে
এত আশা ভালবাসা, এতই নিরাশা,
এত দুঃখ কেন ?
প্রেমের প্রবাহ হায় ! কেন না বহিয়া যায়
এমন মধুরে, কেন আকাঙ্ক্ষা স্বপন,
নাহি হয় হায় ! শান্ত মধুর এমন !

১২৪ পলাশির যুদ্ধ/মসীযুদ্ধ

ধর্মাধিকরণে বসি নিম্নকর্মচারী,
উদরে জঠরজ্বালা, গুরু কার্যভারে
অবনতমুখ—ওই হংসপুচ্ছধারী
বীরবর,—যুঝিতেছে অনন্ত প্রহারে
মসীপাত্র সহ, প্রভু-পদাঘাত-ভয়ে।
যথা শালবৃক্ষ করে, গিরি-শিরোপরে
যুঝিল ত্রেতায় বীর অঞ্জনাতনয়,
নীল সিন্ধু সহ, ডরি সুগ্রীব বানরে।
ঘর্মসহ অশ্রুবিন্দু বহে দরদর,
ভাবিতেছে এই পদ ত্যজিবে সত্বর।

না জানি কি ভবিষ্যৎ, আশা মায়াবিনি !
চিত্রিলে নয়নে তার ; মুছি ঘর্মজল
মুছি অশ্রুজল পুনঃ লইয়া লেখনী
আরম্ভিলা মসীযুদ্ধ হইয়া সবল ।

১২৫ শ্মশান ॥ প্রিয়নাথ সেন

গ্রামের সুদূর প্রান্তে—ভগ্ন দেবালয়
তাহার চরণে লগ্ন—বিস্তীর্ণ শ্মশান
নীরব নির্জন ।—যেন আপনারে লয়
করিয়াছে প্রেতভূমি সমর্পিয়া প্রাণ
শিয়রের দেবীপদে—ধ্যান-নিমগনা
ঊর্ধ্বে দেখে শুধু সেই এক নভ :—আর
মন্দিরের মহাভয়—লেলিহ রসনা
মরণের ক্ষুদ্র ভয়ে করিছে সংহার ।

আমার জীবন হোক শ্মশান প্রখর
দাঁড়াও পাবনী তাহে একা—একেশ্বরী
পুড়ুক নিয়ত তাহে যা কিছু নশ্বর,
পাপ যাহা মৃত্যু যাহা—যাহা মৃত্যুকরী
তোমাতে নিমগ্ন—লুপ্ত—তুমি প্রাণময়
বিশ্বের সে চিরচিতা ধরিবে হৃদয় ।

১২৬ প্রতিভার উদ্বোধন ॥ অক্ষয়কুমার বড়াল

কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ;
গড়িছে—ভাঙ্গিছে বারবার—
একি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির !
পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস,
এ কি দুঃখ—না এ সুখ অতি !

বাস্তব—না কল্পনা-বিকাশ ?
কামনা-বাসনা মূর্তিমতী !
বিস্ময়-বিহ্বল মহাকবি
চাহিয়া আছেন অনিমিখে—
সম্মুখে ফুটিছে নব রবি,
তারকা ফুটিছে দশদিকে !
চাহে উষা—চকিত নয়ন,
ফুলবাসে বায়ু সুবাসিত ;
উঠে ধীর বিহগ-কূজন—
সৃষ্টি'পরে স্রষ্টা বিভাসিত !
সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া,
অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা—
এস তবে, এস বাহিরিয়া
চিত্ত হতে, চিন্ময়ী চেতনা।

১২৭ অন্ধের গান ॥ বিজয়চন্দ্র মজুমদার

পাখী আমার সাক্ষী আছে, উষা-অরুণ এসেছিল।
কুঞ্জতলে, দীঘির জলে হাসির দীপ্তি ভেসেছিল।
আঁধার ঘরে আমি একা ! আমাকে না দিলে দেখা !
ভুলে গেছে, আগে আমায় কত ভাল বেসেছিল।
শিশির-ধোয়া কুসুমরাশির গাল-ভরা সেই শুভ্র হাসির
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল।
তখন আমি দুয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে,
আমার দুঃখে গাইল পাখী, বাতাস খানিক শ্বসেছিল।
জান্‌ত তারা আগে মোরে কত ভাল বেসেছিল।

১২৮ বঙ্গবাসী ॥ গোবিন্দচন্দ্র দাস

দুধটুকু নাই নারীর বুকে,
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে,
ক্ষুধায় কাতর শিশু-ছেলে
ধূলায় লুটে ছট্‌পট্‌।

শুষ্ক চোখ, কণ্ঠতল,
এক বিন্দু নাইক জল—
লোল-রসনা, ভীম-লোচনা
চাহিছে নারী কট্‌মট্‌।
শতছিন্ন বসন গায়,
শত চক্ষে লজ্জা চায়;
এমনি দৈন্য, এমনি দুঃখ,
যোটে না মোটে ছালার চট্‌।
নীলগিরি নাহি সে খোপা,
শুকনা মরা বিন্না ছোপা;
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ
অযতনে শিবের জট্‌।
শুষ্ক জীর্ণ শ্মশানকালী—
সাবিন্দার খোল পেটটি খালি;
আকালভারে বাঁচান দেহ,
কাঁকাল-ভাঙা কটিতট।
আমি মর্লে তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী॥

১২৯ রজনীগন্ধা॥ দেবেন্দ্রনাথ সেন

না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধ'রে;
কুসুমকামিনী সব মৃত্যু করে অনুভব,
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে ম'রে!
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে।

দুঃখী বাঙ্গালীর পক্ষে সুখের রজনী!
মসীর সলিলে ভেসে সারাদিন খেটে এসে,
পায় যদি নিশিগন্ধা সঙ্গের সঙ্গিনী;
আঁধার জীবন তার আঁধার অবনী।

১৩০ হরিদ্বার

সৌন্দর্য বিভোর হয়ে—প্রাতে যবে দেবের অর্চন
হয় শত দেবালয়ে, চারিধারে শঙ্খঘণ্টা বাজে,
গঙ্গাতীরে বসি ধীরে, ভাবি আমি বিস্ময়ে মগন
এ কি রূপ মরি মরি ! কোন্ র‍্যাফেলের বর্ণ-সাজে
পুলকে জাগিল ছবি সুফলকে বিশ্বে অতুলন ?
লাজে হারে কাশী কাঞ্চী। দেবের মালঞ্চ যেন রাজে
এ তো গো নগরী নয়। কল্পনার কুঞ্জবন-মাঝে
সুকবি হেরেছে যেন অপরূপ সৌন্দর্যস্বপন।
সৌন্দর্যের চির উপাসক আমি। আঁখি মুদে আসে।
কেবা হরি ? কেবা হর ? নাহি থাকে নাম রূপ জ্ঞান
পলকে পলকে আসি, ঝলকিয়া, নেত্রপটে ভাসে
সুন্দরের শত মূর্তি ! শত নেত্রে করি আমি পান
সেই লাবণ্যের ধারা !—সুন্দরের চরণ-বাহিনী,
সৌন্দর্যের পূত গঙ্গা, হের, ধায় সাগর-বাহিনী।

১৩১ আমার প্রাণ ॥ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনে ! বারেক আজ, বুকের পাষাণখানি
দেও সরাইয়া।
শূন্য পথ ভাসাইয়া জনস্রোত মাতাইয়া
এই জ্যোৎস্নার সনে যাই মিশাইয়া।
ইচ্ছা করে একবার, অনাদি অনন্ত এই
গগনের তলে।
কলেবর বিস্তারিয়া হৃদয় বিদীর্ণ করি,
দিই প্রাণ ঢেলে।
ক্ষত মর্মস্থান হ'তে, অজস্র প্রপাত-পাতে,
পরাণ আমার।
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় ঝরিয়া পড়ুক ভূমে,
ভাসায়ে সংসার !

প্রাণের নিভৃত ব্যথা, নর নারী হৃদে যাহা—
আমার মতন,
আমার পরাণ সনে, উথলি উঠুক তাহা,
আকুলি ভুবন।

১৩২ প্রলয় ॥ মানকুমারী বসু

দেবতা গো!
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া।
সহসা অসহ্য তাপে অবনীর হিয়া কাঁপে,
প্রাণে প্রাণে অগ্নিপিণ্ড উঠিছে জ্বলিয়া;
উত্তপ্ত জগৎ-ভার বহিতে না পারি আর
বাসুকি সে লক্ষ ফণা ফেলে আছাড়িয়া—
লক্ষ মুখে রক্ত উঠে লক্ষ শ্বাসে বহ্নি ছোটে,
লক্ষ ভালে কাল ঘাম উঠে উচ্ছুসিয়া—
বিশ্বের পঞ্জরগুলি হ'ল বুঝি গুঁড়ি ধূলি,
হিমালয় কুমারিকা গেল যে মিশিয়া—
গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া।

দেবতা গো!
গেল যে তোমার সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া!
গভীর গরজি সিন্ধু, পরশিছে রবি ইন্দু
উন্মত্ত তরঙ্গ ব্যোমে ফেলে যে গ্রাসিয়া!—
পাইয়া বিষম ত্রাস, আচ্ছাদি জলদ-বাস,
মার্তণ্ড ঢাকিছে মুখ পশ্চিমে হেলিয়া।
বুঝি বা পাতালবাসী ফেন হয়ে আসে ভাসি,
তাদের সে অস্থিমজ্জা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
বিচূর্ণ অর্ণব-যান্ আরোহী লইয়া!

১৩৩ বলি ত হাসব না ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বলি ত হাস্‌ব না, হাসি রাখতে চাই ত চেপে ;
কিন্তু, এ ব্যাপার দেখে, থেকেথেকে, যেতে হয় প্রায় ক্ষেপে।
সাহেব-তাড়াহত, থতমত, অঞ্চলস্থ স্ত্রীর,
ভূত-ভয়গ্রস্ত, পগারস্থ, মস্ত মস্ত বীর ;
যবে সব কলম ধ'রে, গলার জোরে দেশোদ্ধারে ধায় ;
তখন আমার হাসির চোটে, বাঁচাই মোটে, হয়ে ওঠে দায়।
যবে নিয়ে উড়ো তর্ক, শাস্ত্রিবর্গ টিকি দীর্ঘ নাড়ে ;
একটু গ্যানো প'ড়ে কেহ চড়ে বিজ্ঞানেরই ঘাড়ে ;
কোর্ত্তে একঘরের মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া ;
তখন আমি হাসি জোরে, গুম্ফ ভ'রে, ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে ;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত ধর্ম ভাঙে গড়ে ;
যখন কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরেন হরির মালা—
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখতে পারে কোন্—

১৩৪ সিন্ধু-তরঙ্গ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফেটেছে তরণীতল সবেগে উঠিছে জল,
সিন্ধু মেলে গ্রাস।
নাই তুমি, ভগবান, নাই দয়া, নাই প্রাণ,
জড়ের বিলাস।
ভয় দেখে ভয় পায়, শিশু কাঁদে উভরায় ;
নিদারুণ 'হায় হায়' থামিল চকিতে।
নিমেষেই ফুরাইল কখন জীবন ছিল
কখন জীবন গেল নারিল লখিতে।
যেন রে একই ঝড়ে নিভে গেল একত্তরে
শত দীপ আলো ;
চকিতে সহস্র গৃহে আনন্দ ফুরালো ॥

প্রাণহীন এ মত্ততা না জানে পরের ব্যথা
না জানে আপন।
এর মাঝে কেন রয় ব্যথাভরা স্নেহময়
মানবের মন।
মা কেন রে এইখানে, শিশু চায় তার পানে,
ভাই সে ভায়ের টানে কেন পড়ে বুকে,
মধুর রবির করে কত ভালোবাসাভরে
কতদিন খেলা করে কত সুখে দুখে।
কেন করে টলমল দুটি ছোটো অশ্রুজল,
সকরুণ আশা।
দীপশিখাসম কাঁপে ভীত ভালোবাসা॥

১৩৫ পরশপাথর

তখন যেতেছে অস্তে মলিন তপন।
আকাশ সোনার বর্ণ, সমুদ্র গলিত স্বর্ণ,
পশ্চিম দিগ্বধূ দেখে সোনার স্বপন।
সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর নুয়ে পড়ে দেহভার
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘপথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কতদূর নাহি তার শেষ।
দিক হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূ ধূ করে
আসন্ন রজনীছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন ক্ষণে চক্ষু বুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর,
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশপাথর॥

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এসো, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়সিংহ। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায় রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব। থাক্ ও-সকল কথা।
দেখ্ চেয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই। থাক্
দেবী। অপর্ণা, জানিস কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা? শুধু তাই বল্।
যা শুনিলে মুহূর্তে অতলে মগ্ন হয়ে
ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ। অপর্ণা, এমন কিছু বল্…

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারি নে কিছু—
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়সিংহ। তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক কথা।—
এ কী করিতেছি আমি! অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে!

১৩৭ নৈবেদ্য-৮৭

আমার এ মানসের কানন কাঙাল
শীর্ণ শুষ্ক বাহু মেলি বহু দীর্ঘকাল
আছে ক্রুদ্ধ ঊর্ধ্ব-পানে চাহি। ওহে নাথ,
এ রুদ্র মধ্যাহ্ন-মাঝে কবে অকস্মাৎ
পথিক পবন কোন্ দূর হতে এসে
ব্যগ্র শাখাপ্রশাখায় চক্ষের নিমেষে
কানে কানে রটাইবে আনন্দমর্মর,
প্রতীক্ষায় পুলকিয়া বনবনান্তর।
গম্ভীর মাভৈঃ মন্দ্র কোথা হতে বহে
তোমার প্রসাদপুঞ্জ ঘনসমারোহে
ফেলিবে আচ্ছন্ন করি নিবিড়চ্ছায়ায়।

তারপরে বিপুল বর্ষণ। তারপরে
পরদিন প্রভাতের সৌম্যরবিকরে
রিক্ত মালঞ্চের মাঝে পূজাপুষ্পরাশি
নাহি জানি কোথা হতে উঠিবে বিকাশি।

১৩৮ গান্ধারীর আবেদন

হে আমার
অশান্ত হৃদয়, স্থির হও। নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি। যেদিন সুদীর্ঘ রাত্রি-'পরে
সদ্য জেগে উঠে কাল সংশোধন করে
আপনারে, সেদিন দারুণ দুঃখদিন।
দুঃসহ উত্তাপে যথা স্থির গতিহীন
ঘুমাইয়া পড়ে বায়ু—জাগে ঝঞ্ঝাঝড়ে
অকস্মাৎ, আপনার জড়ত্বের 'পরে
করে আক্রমণ, অন্ধ বৃশ্চিকের মতো

ভীমপুচ্ছে আত্মশিরে হানে অবিরত
দীপ্ত বজ্রশূল, সেই মতো কাল যবে
জাগে, তারে সভয়ে অকাল কহে সবে।
লুটাও লুটাও শির, প্রণম রমণী,
সেই মহাকালে ; তার রথচক্রধ্বনি
দূর রুদ্রলোক হতে বজ্রঘর্ঘরিত
ওই শুনা যায়। তোর আর্ত জর্জরিত
হৃদয় পাতিয়া রাখ তার পথতলে।

১৩৯ গীতাঞ্জলি-১২৫

আমার এ গান ছেড়েছে তার
সকল অলংকার,
তোমার কাছে রাখে নি আর
সাজের অহংকার।
অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝংকার।
তোমার কাছে খাটে না মোর
কবির গরব করা,
মহাকবি, তোমার পায়ে
দিতে চাই যে ধরা।
জীবন লয়ে যতন করি
যদি সরল বাঁশি গড়ি,
আপন সুরে দিবে ভরি
সকল ছিদ্র তার।

১৪০ পূজাগান-৩৩৭

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।
তুমি আছ, বিশ্বনাথ, অসীম রহস্যমাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি—আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

১৪১ একজন লোক

পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষরেখাতে
যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।
ওকে শুধু জানলুম, একজন লোক।
ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই,
কিছুতে নেই কোনো দরকার,
কেবল হাটে-চলার পথে
ভাদ্রমাসের সকালবেলায়
একজন লোক।

সেও আমায় গেছে দেখে
তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায়,
যেখানকার নীল কুয়াশার মাঝে
কারো সঙ্গে সম্বন্ধ নেই কারো,
যেখানে আমি—একজন লোক।

তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায়;

স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে,
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে ;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদি দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে ;
কোনোখানেই নেই
আমি—একজন লোক ।

১৪২ ছোটো প্রাণ

ছিলাম নিদ্রাগত,
সহসা আর্তবিলাপে কাঁদিল
রজনী ঝঞ্ঝাহত ।
জাগিয়া দেখিনু পাশে
কচি মুখখানি সুখনিদ্রায়
ঘুমায়ে ঘুমায়ে হাসে ।
সংসার-'পরে এই বিশ্বাস
দৃঢ় বাঁধা স্নেহডোরে
বজ্র-আঘাতে ভাঙে তা কেমন করে ।

সৈন্যবাহিনী বিজয়কাহিনী
লিখে ইতিহাস জুড়ে ।
শক্তিদম্ভ জয়স্তম্ভ
তুলিছে আকাশ ফুঁড়ে ।
সম্পদসমারোহ
গগনে গগনে ব্যাপিয়া চলেছে
স্বর্ণমরীচিমোহ ।
সেথায় আঘাতসংঘাতবেগে
ভাঙাচোরা যত হোক
তার লাগি বৃথা শোক ।

কিন্তু হেথায় কিছু তো চাহে নি এরা।
এদের বাসাটি ধরণীর কোণে
ছোটো ইচ্ছায় ঘেরা।
যেমন সহজে পাখির কুলায়
মৃদুকণ্ঠের গীতে
নিভৃত ছায়ায় ভরা থাকে মাধুরীতে।
হে রুদ্র, কেন তারো'পরে বাণ হান,
কেন তুমি নাহি জান
নির্ভয়ে ওরা তোমারে বেসেছে ভালো,
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমার আলো।

১৪৩ ভারতবিধাতা

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

১৪৪ ঐকতান

এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার।
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে।
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা, তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি ;—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার ॥

১৪৫ মেথর ॥ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি ?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে ;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেতো বনে।
শিশু জ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রি দিন সর্ব ক্লেদ গ্লানি।
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে ;—
হে বন্ধু ! তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।

নির্বিচারে আবর্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্বিকার সদাশুচি তুমি গঙ্গাজল !
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।

পূরিবে বাসনা ? শোনে সে অশোনা করুণাকোমল শান্ত স্বর,
দেখে দেবতার অসীমে প্রসার, বরাভয়-ভরা দখিণ কর ।—
"ফিরে যাও ঘরে প্রভাতী প্রহরে জীয়ায়ে উঠিবে বিগতপ্রাণা,
জাগিবে আবার, তিন দিন তার বরতনুখানি দেখিতে মানা।
কোনো প্রলোভনে চাবে না পিছনে, পথের প্রান্তে মিলিবে সাথী,
পল্লবে ঢাকি রেখো দুই আঁখি শুধু তিন দিন, তিনটি রাতি ।"
জড়ায় তাহাকে সহস্র পাকে সংশয়জাল গগন-বেড়,
একি আহ্লাদ, একি পরসাদ, একি বরদান কৃতান্তের !
তাহারি উপরে নির্ভর করে চিত্ত-রমার নব জীবন ;
অকালদৃষ্টি করিবে সৃষ্টি দ্বিতীয় মৃত্যু আরও ভীষণ।
চলে চোখ বুঁজে, সোজা পথ খুঁজে পায় না গহনে ঘুরিয়া মরে,
কঠিন শিলায় মাথা ঠুকে যায়, রক্ত জমেছে মুখের'পরে ।
প্রাণ করি পণ করে নিবারণ চোখের মারণ-যন্ত্র দুটি ;
ক্ষণেক চাওয়ায় অনেক হারায়—বড় আফ্‌শোষ ঘটিলে ত্রুটি ।
শোনে বিস্মিত সেই পরিচিত ললিত-কণ্ঠ গীত-লহর,
একি সম্ভব ? একি বাস্তব ? ভরে আশ্বাসে শ্রুতি-কুহর ।
পোহায় যামিনী, কে অনুগামিনী চরণ ফেলিছে ঝরাপাতায়,
কাঙাল দুচোখ, কাঁপিছে পলক অন্তরাত্মা দেখিতে চায় ।
গাহিতেছে সে-ই, চাহিতে যে নেই, লোপ পায় তার সময়-জ্ঞান,
সহে না সবুর, লোভের অসুর নিক্ষেপ করে মৃত্যু-বাণ।
চাহে পিছু পানে, চুম্বন টানে, আচম্বিতে সে গ্রীবা ফেরায়—
অলখ্ সুতায় বাঁধিয়াছে তায়, বড়িশবিদ্ধ মীনের প্রায় ।
ঘন কুয়াশায় মিলাইয়া যায় ইউরিদিসের মুক্ত কেশ,—
এই না পার্শ্বে দাঁড়ায়ে ছিল সে, আঁখি পালটিতে নিরুদ্দেশ !
শৈল-রন্ধ্রে আজিও মন্দ্রে অরফিউসের শেষ রোদন,
হয়নিকো শেষ, সঙ্গীত-রেশ করে প্রেয়সীর অন্বেষণ।

১৪৭ কৃষাণীর গান ॥ যতীন্দ্রমোহন বাগচী

পথে ক্ষেতের মাঝে আসতে যেতে
কেউ যদি কার পানে চায়,
লোকে দেখবে কেন আড়ি পেতে—
কার কি তাতে আসে যায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
অমন তো রোজ হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই।

ধর কেউ যদি কা'য় ভালবেসে
বললে কিছু ইসারায়।
যাহা বয়সকালে বলেই থাকে—
কে বল তা ধরতে যায় ?
আর তাতে এমন ক্ষতি কি ?
অমন তো রোজ হয়েই থাকে—
যৌবনের ঐ গতিকই।

কেউ ফাগুনমাসের আঁধাররাতে
ভুলে যদি চুমোই খায়,
আর ধর কেউ তা দেখতে না পায়
কার কি তাতে আসে যায় ?
ক্ষতি কি তায় ক্ষতি কি ?
হবার যা, তা হয়েই থাকে—
সংসারের ঐ গতিকই ॥

১৪৮ গোপীযন্ত্র ॥ কুমুদরঞ্জন মল্লিক

সেতার আমি নই তা জানি, নইকো আমি সারঙ্গ।
তবু আমি বাজবো খানিক ক'রো না কেউ বারণ গো

অসম্ভব বা আজগুবি যা
যেটা বুঝেও যায় না বোঝা,
আমি তারি কারবারী যে, জানি নাকো কারণ গো ॥

আমি ভবের পাগলা পথিক, দমকা হাওয়া বসন্তর,
উড়িয়ে বেড়াই ফাগের পরাগ, পথ যে আমার স্বতন্তর।
চাই অচেনায় চিনিয়ে দিতে
আনন্দকে ছিনিয়ে নিতে,
রসিককে রাগ-রসের মাঝে করতে যে চাই ধারণ গো ॥

ধনী মানীর আদর পেতে করি নাকো প্রাণান্ত,
সহজিয়া সহজ খুঁজি সহজে পাই আনন্দ।
দু'দণ্ডেরি আলাপই খুব,
বাজিয়ে যাবো গাবগুবাগুব,
অকূলের কোন কেন্দ্রবিন্দে করবো গিয়ে পারণ গো ॥

১৪৯ সমাপ্তি

ধূলোট হয়ে গেছে, ভাঙিয়া গেছে মেলা,
পাতের ঠোঙা নিয়ে কাকেরা করে খেলা।
ভাসান হয়ে গেছে বিজন পূজাবাড়ী,
জাগিছে আরতির স্মৃতিটি বুকে তারি।
ফুরায়ে গেল শুভ বিবাহ-উৎসব,
নীরব নহবৎ, নীরব হুলুরব।

যেতেছে পায়ে পায়ে মুছিয়া আলিপনা,
বিদায় নিল সবে, বিরল আনাগোনা।
এই তো শেষ, ওগো এই তো সমাপন,
হৃদয় খালি করে কাঁদায় প্রাণমন!
সহে না প্রাণে এই আসিয়া চলে যাওয়া,
পাওয়ার চেয়ে ভালো ছিল যে পথ-চাওয়া!
এ যেন প্রভাতের মলিন রাকাশশী,
সুখের চেয়ে এতে দুখ যে মাখা বেশী ॥

১৫০ আমার বাড়ী

বাড়ী আমার ভাঙন-ধরা অজয় নদীর বাঁকে,
জল যেখানে আদরভরে স্থলকে ঘিরে থাকে।
সামনে ধূসর বেলা জলচরের মেলা,
সুদূর গ্রামের ঘর দেখা যায় তরুলতার ফাঁকে।

ঠিক দুপুরে বাতাস লেগে নাচে জলের ঢেউ,
আমি দেখি আপন মনে, আর দেখে না কেউ।
জেলেরা দেয় বাচ, লাফায় বোয়াল মাছ,
নীরব আকাশ মুখর করে শঙ্খচিলের ডাকে।

ভাঙা বাড়ীর ভাঙা ঘাটে আছ্‌ড়ে পড়ে জল,
মেঠো ফুলের মিঠা বাসে মন করে চঞ্চল।
যত দূরেই চাই শোভার সীমা নাই,
পল্লীবধূ কল্‌সী ভ'রে জল লয়ে যায় কাঁখে।

মাধবী জুঁই মালতীতে ঘেরা উঠান মোর,
আমের গাছে কোকিল ডাকে দিবস নিশি ভোর
দোয়েল পাপিয়ায় গানে কানন ছায়,
চক্র রচে মৌমাছিরা নিত্য ঝাঁকে ঝাঁকে।

১৫১ রোবাইয়াৎ ই ওমরখৈয়াম ॥ কান্তিচন্দ্র ঘোষ

পৃথ্বী হ'তে দিলাম পাড়ি, নভঃ গ্রহে মনটা লীন—
সপ্তঋষি যেথায় বসি ঘুমিয়ে কাটান রাত্রিদিন।
বিদ্যাটা মোর উঠল ফেঁপে, কাটলো কত ধাঁধার ঘোর—
মৃত্যুটা আর ভাগ্যলিখন—ওইখানে গোল রইলো মোর।

তখন ফিরে মুখটি চুমি মাটীর গড়া পেয়ালাটীর,
সুধাই তারে—রহস্যটার অর্থ সেকি খুব গভীর?
অধর'পরে রাখতে অধর, বাজল কানে অস্ফুট স্বর—
যদিন বাঁচো পান করে নাও, ফিরবে না আর মরণপর।

১৫২ অবাক কাণ্ড ॥ সুকুমার রায়

শুনছ দাদা! ওই যে হোথায় বদ্যি বুড়ো থাকে,
সে নাকি রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে?
শুনছি নাকি খিদেও পায় সারাদিন না খেলে?
চক্ষু নাকি আপনি বোজে ঘুমটি তেমন পেলে?
চলতে গেলে ঠ্যাং নাকি তার ভুঁয়ের পরে ঠেকে?
কান দিয়ে সব শোনে নাকি? চোখ দিয়ে সব দেখে?
শোয় নাকি সে মুণ্ডুটাকে শিয়রপানে দিয়ে?
হয় কি না হয় সত্যি মিথ্যা চল না দেখি গিয়ে!

১৫৩ হেন প্রীতি ॥ যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এ বয়সে হেন প্রীতি কভু নাহি শুনি,
বুক পাতি' মাগি লয় বুকের আগুনি।
ক্ষীণ দিঠি ভরি' হেরে ধরিয়া চিবুক
ব্যথাবিমধুর বলি-বলয়িত মুখ।
কে জানে কি আছে দুটি জরাভরা দেহে,
জুড়ায় একের দাহ অপরের স্নেহে।
এ উহারে দেখে যেন কভু দেখে নাই,
এই বুঝি শেষ দেখা ভাবে দুজনাই।
কেবা কারে আগে ছাড়ে ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
নিমিখ না ফুরাইতে যুগ অবসান।
কৃশ তনু দুরু দুরু ক্ষীণ বাহু-ডোরে,
দীপমুখে শিখা যেন মধুনিশি-ভোরে।
বিস্মিত যৌবন জানায় প্রণাম ঃ
কবি কহে, হেন প্রীতি এই দেখিলাম ॥

১৫৪ ফেমিন রিলিফ

তিন আনা চৌকা—
ভুখা পেটে খেটে খা,
দলে দলে লেগে যা—

কে বলে কঠিন মাটি ? না পোষায় ভেগে যা।
যা বলি তা বলি ভাই, মাটিটে কি রুগ্ণ !
মাংসের লেশ নাই, হাড়গোড় শুকনো।
ঝাঁ ঝাঁ করে দিক্‌রে !
রোদে ফাটে টিকরে,
ঠনকি টনকো মাটি কোপ ওঠে ঠিকরে।
হাত্তোর ভগবান্ !
দিলি কি কঠিন প্রাণ,
কাঁকুরে এ কড়া ঢ্যালা তারও চেয়ে কড়া জান !
ঠিক্ রোদে খাটিরে, কত মাটি কাটিরে,
না জানি সে কত বড় যারে দেবো মাটিরে।
—এই—থুড়ি, চোপ্ চোপ ! হেঁই মারো মারো কোপ !
কারো পরে নেই কোপ্, শুধু কোদালের কোপ্ !
আয় দাদা আগিয়ে, ঝুড়ি ধর্ বাগিয়ে,
তাতাপোড়া দেহখানা দিস্‌নেকো রাগিয়ে।

১৫৫ নারীস্তোত্র ॥ মোহিতলাল মজুমদার

হের, ওই চলিয়াছে পথে নারী যৌবন-উন্মনা—
অপাঙ্গ লালসা-লোল, স্মিত হাসি স্ফুরিছে অধরে ;
অধীর মঞ্জীর, তবু শ্রোণীভারে অলস-গমনা,
বসনের তলে দুটি স্তনচূড়া এখনো শিহরে।
কাংস্যঘটে গঙ্গাজল—সদ্যস্নাতা ফিরে যায় ঘরে,
তপ্ত তনু স্নিগ্ধ এবে, গেছে ক্লান্তি গত যামিনীর,
নাই লজ্জা, নাই খেদ ; মুক্তগতি মৃদুলীলাভরে
যায় চলি'—শুভ্রপক্ষ মরালী সে, ত্যজি পঙ্কনীর।
অকুণ্ঠিত আনন্দের নির্ভয় মূরতি ওযে ভ্রষ্টা কামিনীর।

সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী—কালস্রোতে কমল-আসনা—
মুহূর্তে ধরিল রূপ মোর মুগ্ধ নয়নের আগে ;

হেরিনু সে বিশ্বধাত্রী, সবে করে তারি উপাসনা,
জন্মমৃত্যু বাঁধা আছে পায়ে তার অন্ধ অনুরাগে!
সে যে চির উদাসিনী, তবু তার হৃদয়-পরাগে
কামনার মধুগন্ধ, দেহদীপে করিছে আরতি
সুন্দরের—মূর্তি যার আত্মহারা কাম-সুখে জাগে।
প্রকৃতির প্রাণরূপা, স্বতঃস্ফূর্ত আহ্লাদিনী রতি—
স্বচ্ছন্দ-স্বৈরিণী ওযে, নিত্যশুদ্ধা—নহে সতী, নহে সে অসতী।

১৫৬ নিমগাছ ॥ কালিদাস রায়

বড়ই মিঠা হলো যে নিমপাতা
নিমের ফুলের গন্ধ পেলে চমকে উঠে চাই,
পথে যেতে গুটিয়ে নিয়ে ছাতা
একটুখানি জুড়াই যদি নিমের ছায়া পাই।
মনে পড়ে নিরিবিলি তালপুকুরের ধার,
ঝোপে ঘেরা ঘাটে সে নিমগাছ।
ঝিকিমিকি বিকালবেলা ছায়ার তলে তার
ছিপটি ফেলে বসে থাকা, ধরছি যেন মাছ।
চন্দনে নিম পরিণত, মিষ্ট নিমের পাতা
কেন? শুধু তুমিই জানো, অন্যে জানে না তা।

১৫৭ বিদ্রোহী ॥ নজরুল ইসলাম

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর-মদ
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি।
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান।
আমি ইন্দ্রাণী-সুত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।

আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির।
আমি ব্যোমকেশ, ধরি বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর,
বল বীর—
চির উন্নত মম শির।

১৫৮ অন্তর-ন্যাশন্যাল-সঙ্গীত

জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত !
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ॥
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্রআচার
মূল সর্বনাশেরে এবে ভাঙিব এবার।
ভেদি' দৈত্যকারা
আয় সর্বহারা !
কেহ রহিবে না আর পর-পদ আনত ॥

১৫৯ প্যাক্‌ট

বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্‌টের আসনাই।
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥

আঁটসাঁট ক'রে গাঁট-ছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো ? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে।
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁট হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে।

বুকে বুকে মিল হলোনাক, মিল হলো পিঠে পিঠে তাই সই।
মিঞা কন, 'কোথা দাদা মোর ?' আর বাবু কন, 'মিঞা ভাই কই ?'
বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়চোখোচোখি কি মধুমিলন হইল।

বাবু কন, 'গরু কোরবানী করা ছেড়ে দাও যদি মিঞাভাই,
সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে তোরে মন্দিরে নিয়া যাই।'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞার ঘরে নাহি লও হরিনাম
বলদ সহিত ছাড়িব তোমারে যাহা হয় হবে পরিণাম।'

সারা-রারা-রারা সহসা অদূরে উঠিল হোরির হররা,
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছররা।
লাগে টানাটানি হোঁইয়ো হোঁইয়ো টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্মে ধর্মে করে কোলাকুলি নব-প্যাক্‌টেরি পুণ্যে।

বদনা গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি রোল উঠিল, হা হন্ত
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গি মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত।
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু
আকাশে উঠিল চির জিজ্ঞাসা—করুণ চন্দ্রবিন্দু।

১৬০ রূপসী বাংলা ॥ জীবনানন্দ দাশ

অশ্বত্থে সন্ধ্যার হাওয়া যখন লেগেছে নীল বাংলার বনে
মাঠে মাঠে ফিরি একা : মনে হয় বাংলার জীবনে সঙ্কট
শেষ হয়ে গেছে আজ ; চেয়ে দেখ কত শত শতাব্দীর বট
হাজার সবুজ পাতা লাল ফল বুকে লয়ে শাখার ব্যজনে
আকাঙ্ক্ষার গান গায়—অশ্বত্থেরো কি যেন কামনা জাগে মনে :
সতীর শীতল শব বহু দিন কোলে লয়ে যেন অকপট
উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে,—চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
উজ্জ্বল হতেছে তাই সপ্তমীর চাঁদে আজ পুনরাগমনে ;

মধুকূপী ঘাস-ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি—রায়গুণাকর
আসিবে না—দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার,
কালিদহে ক্লান্ত গাংশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়,
আসিয়াছে চণ্ডীদাস—রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার
শঙ্খমালা চন্দ্রমালা : মৃত শত কিশোরীর কঙ্কণের স্বর।

১৬১ পৃথিবীলোক

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ;
গ্রামপতনের শব্দ হয় ;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা ব'লে মনে হয়।

এ সব শূন্যতা ছাড়া কোনোদিকে আজ
কিছু নেই সময়ের তীরে।
তবু ব্যর্থ মানুষের গ্লানি ভুল চিন্তা সংকল্পের
অবিরল মরুভূমি ঘিরে
বিচিত্র বৃক্ষের শব্দে স্নিগ্ধ এক দেশ
এ পৃথিবী, এই প্রেম, জ্ঞান, আর হৃদয়ের এই নির্দেশ।

১৬২ তোমাকে ভালবেসে

আজকে ভোরের আলোয় উজ্জ্বল
এই জীবনের পদ্মপাতার জল ;
তবুও এ জল কোথার থেকে এক নিমেষে এসে
কোথায় চলে যায় ;
বুঝেছি আমি তোমাকে ভালোবেসে
রাত ফুরুলে পদ্মের পাতায়।

আমার মনে অনেক জন্ম ধরে ছিলো ব্যথা
বুঝে তুমি এই জন্মে হয়েছো পদ্মপাতা ;
হয়েছো তুমি রাতের শিশির —
শিশির ঝরার স্বর
সারাটি রাত পদ্মপাতার পর
তবুও পদ্মপত্রে এ জল আটকে রাখা দায়।

নিত্য প্রেমের ইচ্ছা নিয়ে তবুও চঞ্চল
পদ্মপাতায় তোমার জলে মিশে গেলাম জল ;
তোমার আলোয় আলো হলাম,
তোমার গুণে গুণ ,
অনন্তকাল স্থায়ী প্রেমের আশ্বাসে করুণ
জীবন ক্ষণস্থায়ী তবু হায়।

এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল ঃ
পদ্মপাতায় তোমার আমার মিল।
আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে ;
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার—জল নিয়ে তার নড়ে ;
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

১৬৩ যাচ্ছেতাই ॥ মনীশ ঘটক

ওখানে কবর আছে ওদিকে যেয়ো না।
না খেয়ে ধুঁকছে ওরা ওদিকে চেয়ো না।
অক্ষর চেনে না ওরা কেতাবে কি হবে।
অসুখে ভুগছে ওরা মরুক নীরবে।
যা ইচ্ছে তাই করো স্বাধীন মুলুক।
যে যার নিজের ক্ষেতে পটল তুলুক।

দেরি হয়,
অন্য কিছু নয়।
তীর ছেড়ে দূরে গেলে
নৌকো চলে যায় পাল মেলে,
খেয়াঘাটে দীঘ বেলা বয় ॥

রাস্তা দিয়ে ঘাটে যাবে,
অন্যমনস্কের মোড়ে
যদি যাও বাঁকা গলি ধ'রে—
জেনেশুনে
যদি বা কাঁটাব পথে চলো ভাগ্যগুণে
হাটে দিন শেষে কাকে পাবে ?

পৌঁছতে হবেই বাড়ি
কেনা-বেচা শেষ ক'রে
গান কণ্ঠে ভরে
ঘরে ফেরা দিনক্ষণে
দিয়ো পাড়ি।
দীপ জ্বলে ঘরের আগুনে ॥

১৬৫ শিল্প

তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রোদ্দুরের সুতো,
নীহারিকা পাড় বোনা, বিদ্যুতি জরির উদ্ভবে :
তোমার পায়ের প্রান্তে লুটোবে যখন যাবে দ্রুত
প্রাণের বসন্তদিনে কত কী উৎসবে।
কত তুলো, কত রঙ, কত কল্পনায়, মায়াময়
তোমার সে বেনারসি বোনা হয় ;

তুমি তো জানো না,
প'রে শুধু আশ্চর্যের লগ্নে তুমি হও অন্যমনা।
যা দিয়েছিলেম সে তো প্রাণরক্ত, অন্য সে রক্তিমে :
আঁচল সোনালি গাঢ় আমারি প্রেমের মুগ্ধ হিমে ;
সঙ্গে কত স্পর্শভরা জড়ায় অস্পর্শ আলিম্পন
সাত-পাকে ঘোরো যবে তোমার জীবনে শুভক্ষণ ,
মর্ত্যে এসে মাঙ্গলিক রেখে যাই,
অনামী শিল্পের গায়ে বাসনার ধেয়ান মেশাই ;
তাঁতির আঙুল জানে কত সুতো গেঁথে গেঁথে শেষে
প্রাণে প্রাণে কত দানে তোমার অর্ঘ্যের দান মেশে।

১৬৬ বর্ষশেষ ॥ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

দহনক্লান্ত দুপুরবেলার ঝাঁজে
অন্যমনে চলেছিলুম রিক্ত পথের মাঝে।
ছিল নাকো অন্তরে আর আশা ;
দুঃস্থ মাথার চিন্তাগুলো কণ্ঠে খুঁজে পাচ্ছিল না ভাষা ;
হচ্ছিল বোধ অবুঝ হৃদয়খানা
কুলায়বিমুখ চিলের মতো মুক্তাকাশে প্রসার ক'রে ডানা
দিচ্ছে পাড়ি মৃত্যু অভিযানে
আত্মঘাতী ঊর্ধ্বরবির অগম চিতার পানে ;
বক্ষে খালি
হুমকে উঠে শূন্যতা আর ফল্গুনাশা বালি
আত্মগ্লানির ঘূর্ণিবেগে আপনাকে দেয় উড়িয়ে দিগন্তরে
যেথায় অবিরত
নেচে নেচে গাজনপাগল বৈরাগীদের মতো
দশা পেয়ে শীর্ণ হাওয়া মরে।
এমন সময় আড়াল থেকে রঙ্গনিপুণ নাগরিকার প্রায়
প্রাণদেবতা হঠাৎ ছুঁড়ে মারলে আমার গায়
পীতলোহিতের চূর্ণমুঠি গুলমোরের ফুলে।

চমকে উঠে দেখলুম চোখ তুলে ;
মনে হল পত্রবিরল গাছের অন্তরালে
কোন্ চরণের সোনার নূপুর বেজে বারেক নাম-না জানা তালে
লুকিয়ে গেল ধরা পড়ার আগে ;
রোমাঞ্চিত হল শরীর কিসের অনুরাগে।
জানি না সে স্বপ্ন কিনা ; কিন্তু যদি স্বপ্ন ব'লেই মানি,
নয় কি আরও অসার স্বপন আর বছরের শুকনো মালাখানি ?

১৬৭ হলুদ বাটিছে মেয়ে ॥ জসীমউদ্‌দীন

হলুদ বাটিছে হলুদ-বরণী মেয়ে,
হলুদের পাটা হাসিয়া গড়ায় রাঙা অনুরাগে নেয়ে।
দুই হাতে ধরি কঠিন পুতারে ঘসিছে পাটার পরে,
কাঁচের চুড়ী যে রিনিক ঝিনিকি নাচিছে খুশীর ভরে।
দুইটি জঙ্ঘা দুইধারে মেলা কাঠ-গড়া কামনার,
তাহার উপরে উঠিছে নামিছে সোনার দেহটি তার ;
মর্দিত দুটি যুগল সারসী শাড়ীসরসীর নীরে,
ডুবিতে ডুবিতে পুষ্প ধনুরে স্মরিতেছে ঘুরে ফিরে।

হলুদ বাটিছে হলুদ-বরণী মেয়ে,
হলুদে লিখিত রঙিন কাহিনী গড়াইছে পাটা বেয়ে।
ডোলভরা ধান, কোলভরা শিশু, বুকভরা মিঠে গান,
কোকিল-ডাকান আম্র ছায়ায় পাতার কুটীর-খান ;
চাঁদনী রাতের জ্যোছনা আসিয়া গড়ায় বেড়ার ফাঁকে
কৃষাণ কণ্ঠে বাঁশীটি বাজিয়া আকাশেতে প্রীতি আঁকে।
অর্ধেকরাত নক্সীকাঁথাটি মেলন করিয়া ধরি
অতি যতনে আঁকে ফুললতা মনের মমতা ভরি।
সুখ যেন আসি গড়াইয়া পড়ে, সূতার লতালী ফাঁদে,
মাটির ধরায় টেনে নিয়ে আসে গগনবিহারী চাঁদে।

১৬৮ বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়

রাত দুপুরে মেঘে মেঘে কড়াৎ কড়াৎ শব্দ যখন হয়,
দুই নখেতে আঁধার চিরি বিজলী যখন জ্বলে ভুবনময় ;
তুফান ছোটে জোর দাপটে, বৃষ্টি পড়ে মেঘের ঝাঁজর ঝরে,
বছিরদ্দির ঘুম ভেঙে যায়—মুহূর্ত সে রইতে নারে ঘরে।
বিলের জলে টাইটুবানি রোহিত কাতল মাছেরা দেয় ফাল ,
কই মাগুরের দল সাঁতারে আঁকাবাঁকা ধরি গাঁয়ের খাল।

এমন সময় বছিরদ্দি একহাতেতে তীক্ষ্ণ টেঁটা ধরে,
আর এক হাতে মশাল জ্বালি বীর দাপটে ছোটে মাঠের পরে।
বুড়ীর ভিটায় বিড়াল ডাকে, তালতলাতে গলায় দড়ি দিয়ে,
মরেছিল তাঁতীর বধূ—এসবে তার কাঁপায় নাকো হিয়ে।
শেওড়া বনে পেত্নী নাচে, হাজরাতলায় পিশাচে দেয় শিস্,
বিলের ধারে আগুন জ্বালি ভূতেরা সব ফিরছে নানান দিশ্।
ভয় নাহি তার কারও কাছে, রাতের আঁধার মশাল দিয়ে ঠেলে,
একলা চলে বছিরদ্দি জোর দাপটে চরণ দুখান ফেলে।
হাতে তাহার তীক্ষ্ণ টেঁটা, গায়ে তাহার মোষের মত জোর,
চোখ দুটিতে উল্কা জ্বলে যমদূতেরও দেখে লাগে ঘোর।

রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ মারিতে যায়—
দূর হতে তার মশাল জ্বলে ধকো ধকো রাতের কালো ছায়।
বৃষ্টি-শিলা মাথায় পড়ে, তুফান চলে ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মত,
রয়ে রয়ে বিজলী জ্বলে ইন্দ্র ডাকে আঁধার করি ক্ষত ;
শ্মশান-ঘাটায় পেত্নী নাচে, বটের শাখে পিশাচ দোলা খায়,
রাত দুপুরে বিলের পথে বছিরদ্দি মাছ ধরিতে যায়।

১৬৯ নক্সীকাঁথার মাঠ/বদনা-বিয়ের গান

চৈত্র গেল ভীষণ খরায়, বোশেখ রোদে ফাটে,
এক ফোঁটা জল মেঘ চোঁয়ারে নাম্‌ল না গাঁ-র বাটে।

এমন সময় ওই গাঁ হতে বদনা-বিয়ের গানে,
গুটি কয়েক আসলো মেয়ে এই না গাঁয়ের পানে।
আগে পিছে পাঁচটি মেয়ে—পাঁচটি রঙের ফুল,
মাঝের মেয়ে সোনার বরণ, নাই কোথা তার তুল।
মাথায় তাহার কুলোর উপর বদনা-ভরা জল,
তেল-হলুদে কানায় কানায় করছে টলমল।
পাঁচটি মেয়ের মাঝের মেয়ে লাজে যে যায় মবি,
বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি।
মেয়ের দলে বেড়িয়ে তারে চিকণ স্থবের গানে
গাঁয়ের পথে যায় যে ব'লে বদনা-বিয়ের মানে।

কালোমেঘা নামো নামো, ফুলতোলামেঘ নামো,
ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো।
কাণা মেঘা টলমল বার মেঘার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক দিলে চীনাব ভাত খাই।
কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া।
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।

বারো মেঘের নামে নামে এমনি ডাকি ডাকি,
বাড়ি বাড়ি চল্‌ল তারা মাগুন হাঁকি হাঁকি।

১৭০ মুখ ॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র

একটা মুখ কাঁদায় হয়ে শীতের রাতে পথে অনাথ শিশু
মেলায় বাজিকরের খেলায় একটা মুখ মুখোশ প'রে হাসায়।
খেয়ার নায়ে ওপারে যেতে কবে যে কোন ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে অকূল স্রোতে ভাসায়!

কার সে মুখ, কার ?
জানে কি তারা-ছিটোন অন্ধকার !
সে মুখ যারা দেখেনি তারা জানে না জ্বালা নিদান যার নেই।
শীতের দিনে পোহায় রোদ উঠোনে বসে আরামে কাঁথা গায়
ঝুমকো লতা দেয়ালে তোলে, মরাই রাখে ভ'রে,
ফল কি ফুল পাড়তে শুধু নাগাল ডাল নামায়।
হোক সে মুখ যার,
অনিদ রাতে কাঁপে না অন্ধকার।
সে মুখ যার পড়েছে চোখে ঘরেই থাকে যায় না সেও বনে,
বসত করে পাঁচিল ঘিরে, হিসেব করে পুঁজি যা আছে ভাণ্ডায়।
তবুও কোন হতাশ হাওয়া একটা ছেঁড়া ছায়া
তারার ছুঁচে সেলাই ক'রে রাত্রি জুড়ে টাঙায়।
কার সে ছায়া, কার ?
প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার।

১৭১ পণ ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়

করেছি পণ নেবো না পণ বউ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।
স্যাকরা ডেকে দেখবো নিজে আসল কিংবা কম্‌দরী।
সোনায় হবে সোহাগা যে বৌ যদি হয় সুন্দরী।

তোমরা সবে শুধাও তবে—আমিই বা কোন্ কার্তিক !
প্রশ্ন শুনে কোথায় যাব, বন্ধ দেখি চারদিক।
মানতে হলো দরকারটা উভয়তই আর্থিক।
স্বর্ণের নাম সুন্দরী, আর মাইনের নাম কার্তিক।

১৭২ ছাগল ॥ অজিত দত্ত

গাম্ভীর্য ও প্রজ্ঞা যেন বিচ্ছুরিত দাড়ির আভাসে,
শৃঙ্গ দেখে শঙ্কা হয় তেড়ে বুঝি ঢুঁ মারে কখন,

উদাসীন দৃষ্টি, কিন্তু তৃণশষ্পে লক্ষ্য বিলক্ষণ,
যাহা পায় তাহা খায় দ্বিধাহীন নির্বিচার গ্রাসে।
নধর মাংসল দেহ, তবু কিন্তু খুঁটি ছেঁড়ে না সে,
সঞ্চয়ের মূল্য জানে, ফল পায় চর্বিত-চর্বণ।
ধারে না রুচির ধার, নির্বিকল্প অনুদ্বিগ্ন মন,
তত্ত্ববেত্তা দার্শনিক, বিশ্বরূপ দেখে কচি ঘাসে।
অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা, ভুমো ভুমো কিংবা মিহি কিমা,
স্বাস্থ্য আর কান্তি দানে সবি ধন্য সভ্যতার হিতে।
সর্বদেশে-কালে প্রিয়, হোক পক্ব যে কোনো রীতিতে,
ধর্মে-কর্মে পালে-পর্বে স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় মহিমা।
বলিবাদ্যে কীর্তি ঘোষে নিজ চর্মে গড়া জয়ঢাক—
তবুও কী সহ্যশীল দণ্ডাহত শ্যামল পোশাক ॥

১৭৩ রাত্রিভেদী দীপ ॥ সুনীলচন্দ্র সরকার

রাত্রিভেদী দীপ নিয়ে ফেরো ঘরে ঘরে
যদি কেউ জাগে
কালের সমস্ত কালো পিছনে পিছনে
তুমি আগে আগে
কোথাও আপন মনে হেসে চলে যাও
কোথাও দাঁড়াও
খুলে রাখা জানালার আকাঙ্ক্ষার ফাঁকে
বাতিটি বাড়াও।
সে-দয়ায় কোনো নম্র ঘুমের হৃদয়ে
দেখা দেয় তারা
হয়তো বা তাও নয় শুধু চমকায়
অভ্যস্ত পাহারা।
দৈবাৎ এমনও হয় জাগার যে জাগে
দেখে সে তোমাকে
তখনি সাবধান রাত্রি অদাহ্য আঁচলে
সে বিপ্লব ঢাকে।

১৭৪ তপস্বী ও তরঙ্গিণী / সংস্তব ॥ বুদ্ধদেব বসু

আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা ;
শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পরে দিন দীর্ণ, শূন্য—
বৃষ্টি নেই !

দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ,
তবু তো কিছু ভালো মেনেছি সংসারে, জেনেছি দেবতারা বন্ধু—
যেহেতু ফলে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে,
এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন।

বল তো, বোন, কবে আবার মধুমতী গাভীর বাঁট হবে উচ্ছল ?
ঢেঁকির গম্ভীর শব্দে দিয়ে তাল জাগবে হাতে পায়ে ভঙ্গি ?
ব্যাঙের ছাতা কবে সাজাবে পৃথিবীরে ? ডাকবে উল্লাসে দর্দুর ?
শিশিরবিন্দুর আদরে ভরপুর ঝুলবে আঙিনায় কুমড়ো ?

যেমন বেঁচে থাকে কেন্নো, কেঁচো, আর মাটিতে বুক টেনে পন্নগ,
যোজন পার হয়ে ক্লান্ত কূর্মেরা আবার ফিরে পায় সিন্ধু,
তেমনি ঋতু আর শ্রমের আশ্রয়ে চিন্তাহীন বাঁচি আমরা—
অথচ বিনা কাজে বিহান কাটে আজ, নামে না সন্ধ্যায় শান্তি।

অঙ্গরাজ ! বলো, করেছি কোন পাপ, এ কোন অভিশাপ লাগলো !
জননী বসুমতী, ভুলো না আমরাও তোমারই গর্ভের পরিণাম।
হে দেব ঐরেশ ! মহান ! মঘবান ! এবার দয়া করো, বৃষ্টি দাও—
বৃষ্টি দাও।

১৭৫ জন্মাষ্টমী ॥ সঞ্জয় ভট্টাচার্য

জলে হাত রেখে বোঝা যায়
এই জলে ছিলেন ঈশ্বর।

জল নড়ে উঠে জলে
তারপর হাতের ভেতর।
হাত বেয়ে সমস্ত শরীরে।
মনে হয় কবে যেন বৃষ্টি হয়েছিল।
জলে হাত রেখে বোঝা যায়॥

১৭৬ ২৫ বৈশাখ॥ বিষ্ণু দে

আমরা যে গান শুনি, গান করি আকাশে হাওয়ায়
ফুলে ফুলে বনে পথে ঘরে-ঘরে সন্ধ্যায় সকালে,
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি স্তব্ধ ছন্দের মায়ায়
রঙের রেখার মুক্তি কল্পনার নব-নব তালে
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা
হাজার সন্ধ্যার সূর্য প্রত্যূষের হাজার সবিতা—

রবীন্দ্র-ব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে-গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রং
সদাই নূতন চিত্রে গল্পেকাব্যে, হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎস খুঁজে পাই খরস্রোত নব-আনন্দের।

জঙ্গম সূর্যকে জানি আমাদের জঙ্গী প্রতিদিনে
অবিচ্ছিন্ন মাসে-মাসে বর্ষে-বর্ষে যুগ-যুগ ব্যেপে
প্রতিটি ঊষায় রাত্রে মধ্যাহ্নের বটে দগ্ধতৃণে
গলাপিচে বৈশাখীর ভবিষ্যতে ঝড়ে মেতে ক্ষেপে
প্রতিটি সূর্যাস্তে আর সূর্যোদয়ে চৈতালী নিদাঘে
আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রাণে হিম মাঘে
আমরা তো জানি তুমি আকস্মিকে গরম বাজারে
রুদ্ধগতি, তাই গড়ি জীবনের ঝরনা, রচি, কবি,
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে-লাখে হাজারে-হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দভৈরবী।

১৭৭ বৃষ্টির দেশ থেকে এলে ॥ অরুণ মিত্র

তুমি বৃষ্টির দেশ থেকে এলে। এই এতগুলো পাতা আমি
জড়ো করেছি, এত ডালপালা। ছাখো তো এরা তোমাকে
আগুন ছাড়া অন্য কথা বলে কিনা।
                যে ছেলেটা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে
তার ঘরে ফিরবার নাম নেই। কি নিয়েই বা ফিরবে? আমি
তাকে এমনিভাবেই রোজ দেখি। আমার বিশ্বাস সে
সবসময় অদৃশ্য হয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করে। কিন্তু তার
কপালের রক্তচিহ্নটা এক একবার আমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে।
তুমি হয়তো বুঝবে। মানুষের লক্ষণগুলো তুমি হয়তো
ঠিক ঠিক জেনে এসেছ।
                পাঁচ ক্রোশ পথ ভেঙে আমি গিয়েছি ইস্পাতের
নদী দেখতে। কোনোই মানে ছিল না। সে-জ্বালাপোড়া তো
এখানকার বাতাস ছেয়ে আছে। তবে এইটুকু আমি অনুভব
করেছি যে আমাদের মাটির ভিতরে অমোঘ উত্তর
রয়েছে। তুমি মৌসুমকে জানো, ফলনকে জানো; এই
মাটিকে একবার তুমি আদর ক'রে ছাখো।
                মুগ্ধতার একটা চেহারা বোধহয় কোনো
এক মুহূর্তে আমার নজরে এসেছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত
নই। তোমার জলছোঁয়া হাত কি তাকে নতুন ক'রে গড়ে
দিতে পারবে?

১৭৮ মধুবংশীর গলি ॥ জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

পট যায় ঘুরে।
অন্ধীকৃত রাত্রির শহরে,
পথে পথে সুগভীর ছায়ার বহর,
ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ত্রস্ত কবন্ধের ভিড়।
সুর-রিয়ালিস্ট কবিতার দেশে।

পিকাসো বা যামিনী রায়ের আঁকা
পথঘাট গাছপালা বাড়ি।
ঊর্ধ্বে নীলে আঁকাবাঁকা চাঁদ,
তারই নিচে নিরন্ন বুড়োবুড়িদের আর্তনাদ,
ক্লিষ্ট চলাফেরা।
অতঃপর ব্রাহ্মমুহূর্তে, ঘর্মস্রাবী রাত্রির ওপারে
আলোকসম্ভবা উষার ওষ্ঠপুটে ভৈঁরোর অস্ফুট আলাপ।
ক্ষুধার গর্জনে ছিন্ন প্রশান্ত গৈরিক।
অগণন বালকবালিকাদের
বুভুক্ষামুখর যাত্রা লেক মার্কেটের দিকে।
নিশ্চিন্ত অবিবেকী মনের শৌখিন গান
তিরস্কৃত, পলাতক দিশাহীন দূরে।
তবু ভাল, আমি এই মধুবংশীপুরে
আছি বেশ ; এবেলা ওবেলা
কেটে যায় ব্যর্থ অন্বেষায়।
তোমার মহিম্ন স্তোত্রে মুখরিত আকাশবাতাস
হে স্বর্ণবণিক ! তুমি দীপ্ত হিরণ্ময়।
তোমারই হোক ক্ষয়, হোক ক্ষয়।

১৭৯ জুতা পালিশ ॥ বিমলচন্দ্র ঘোষ

বেওয়ারিশ যত কিশোর ছেলেরা অর্ধনগ্ন দেহে
পথিকের পদধূলায় মলিন তাকায় না কেউ স্নেহে
জুতা ঝেড়ে মুছে পালিশ লাগায় দুর্বল কচিহাতে
মুখে তবু এক অদ্ভুত হাসি অসীম অজ্ঞতাতে
মহানাগরিক পাদুকাপিষ্ট দুর্ভাগা শিশুদল
পালিশের প্রতিযোগিতায় করে কী করুণ কোলাহল।

১৮০ বন্যা : ১৩৬৬ ॥ দিনেশ দাস

আদিগন্ত করে থইথই
মাঝেমাঝে গ্রামগুলি ভেসে আছে শবের মতই :

ডুবন্ত অশ্বত্থ এক বিরাট শকুনি যেন
শবের উপরে ব'সে নড়েচড়ে :
মাটির সন্তান গিলে আঁটকুড়ো নদী
কোথাও লুকিয়ে আছে জলের ভিতরে।

মড়ার মুখেতে শেষ ছাতু আর গুড়গোলা পিণ্ডি তুলে দিতে,
ক্ষীণ প্রত্যাশার মতো বন্যাত্রাণ ডিঙিগুলি আসে গুড়ি গুড়ি :
কেউ আসে ছড়াতে গরম রাজনীতির ঠোঙায়
খই আর মুড়ি :
আবার কখনো আসে শৌখিন শহুরে লোক
উৎসুক জলের বুকে দোল খেতে
ছুঁড়ে দেবে ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট করুণার টোপ।

ভাসমান শবগুলি প'চে ওঠে আশ্বিনের রোদে,
তবুও জলের নীচে নদী শলাপরামর্শ করে
নির্দয় আমোদে।
কাদামাটি থেকে আসে অশ্রুর মতই লোনা করুণ আঘ্রাণ,
হাওয়ায় হাওয়ায় শুধু ধানগাছ হা হা করে—কাঁদে মরা ধান।

১৮১ স্তোত্র ॥ সমর সেন

আদিদেব একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি।
মহাজন চাষী তিনি সবাকার গতি ॥
কৃষ্ণকালো বড়ো মেঘ জুড়েছে আকাশ।
শ্যামবর্ণ মূর্তি তার চাষীর আশ্বাস।
ধান দেখে মহাজন বলেছে সাবাস ॥
আকাশে শুনেছি আজ মেঘের বিষাণ।
ঘরে ঘরে বুঝি আজ রাসলীলা গান ॥
সাপ যত বসে আছে শিকারের তালে।
রাত্রি এল, মৃত্যু লেখা ব্যাঙের কপালে ॥

মহাজন গান গায়, নন্দারৎ ধান।
অন্ধকার প্রেতলোকে ভাবে ভগবান॥
অক্ষম এ রায়বাবু ঈশ্বর কথনে।
প্রভুর বন্দনা শুনি বেণের ভবনে॥

১৮২ সাপুড়ে ॥ মণীন্দ্র রায়

চৈত্রের দুপুরে তুমি খামারের গর্তে, ইটখোলার
ঝোপে ঝাড়ে, মাঠে মাঠে, ভাঙা দালানের পাশে ঘুরে
বাজাও তোমার বাঁশি একটানা তীক্ষ্ণ সাপতোলার
সুরে সুরে। ডাকো গোখরো কালনাগ বোড়া শঙ্খচূড়ে
গর্তের বাহিরে রৌদ্রে মেলে দিতে ফণার উল্লাস।
তারপর অকস্মাৎ থামে বাঁশি। ধরো মুঠি চেপে,
বিষদাঁত ভেঙে রাখো ঝাঁপির কয়েদে। বারোমাস
নারী আর শিশু হাসে, যতো সে ছোবল হানে ক্ষেপে!
আমাদেরও মাঠে দগ্ধ চৈত্রের দুপুর। ঘরে ঘরে
বিষের নিঃশ্বাস, মনে দুর্ভিক্ষের জ্বালা, হিংস্র দিন
রাত্রির বিবর থেকে ছুটে এসে ক্রুদ্ধ ফণা ধরে।
ভাঙো তার বিষদাঁত, হে সাপুড়ে, কর অন্তরীণ
ঝাঁপির পাতালে, যেন এ সাপেরও মণি লুটে হাসে
প্রত্যহের শিশুসূর্য আমাদের আঙিনার পাশে।

১৮৩ সুন্দর ॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

যখন তোমার আঁচল দমকা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল
তখনও নয়
বিকেলের পড়ন্ত রোদে বিন্দু বিন্দু ঘাম
তোমার মুখে যখন মুক্তোর মত জ্বলছিল
তখনও নয়
কী একটা কথায় আকাশ উদ্ভাসিত ক'রে
তুমি যখন হাসলে
তখনও নয়

যখন ভোঁ বাজতেই
মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র
একটি ক'রে ইস্তাহারের জন্য
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিলো

যখন তোমাকে আর দেখা গেল না

তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।

১৮৪ যাব না সভায়

যে আমাকে চায় আমি তার কাছে যাব

গলায় খেলে না সুর
তবু আমি গাইব গান মৃদঙ্গ বাজাব

বৃষ্টি এলে
বাইরে বেরোব ভিজতে

নদী যদি পারে যেন আমাকে ডোবায়

আমি যেতে চাই না তীর্থে
পুণ্যে নেই লোভ

কেন ডাকো
মন নেই, যাব না সভায়।

১৮৫ অন্নদেবতা ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা ;
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।

অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা ॥

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে ॥

১৮৬ এই যুদ্ধ ·

শুভ হোক তোর ললাট, কুশল
হোক তোর স্তনচূড়া,
হোক রাঙা আবিরের মতো লাল
সন্ধ্যার শত্রুরা।

ভরুক পেয়ালা রাত্রি গভীর হলে,
বুকের ভিতর যায় যদি যাক জ্ব'লে,
শুভ হোক তোর খুনে-আগে রাঙা কুশল···
ঘরে মাতলামো, বাইরে ঝড়-বাদল !

শান্তি তো অপদার্থের, তুই
মৃত্যুকে নিবি কোলে।
শুভ হোক তোর ললাট, কুশল
এ যুদ্ধ শেষ হ'লে···
২০ নভেম্বর ১৯৬৮

১৮৭ হাসো ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

হাসো। শুধু শিউরে ওঠো শরীরের সেতারে ঘা দিয়ে।
নিঃশব্দ ঝঙ্কার হাসি চোখের তারায় মুদারায়
ভাঙুক জ্রূছুটি, রেখা একটি ছুটি কপালে—আত্মায়
ঘাটে ঘাটে উঠে এসো রিনরিন পেশীতে পা দিয়ে।

আলোঅলৌকিক আভা অন্ধকারে আচমকা ফোটাও
হাসো—হও জীবনের বনস্পতি হাসিধারাজলে
শাখায় পল্লবে লোভমদমৃত্যু, হাসো ফুলে ফলে
যন্ত্রণাভূস্তর ভাঙো অশ্রুরস শিকড়ে ওঠাও।

দিলে তো আমাকে সব, সুখ স্বস্তি সংসার সন্ততি
কলরবঅবরোধ বর্তমান সুস্থ মতিগতি—
হাসো, শুধু একবার আমাকে তোমার হাসি দাও।
চৌদিকে চলকায় মন আমি দ্বীপ আমি দূরে-থাকা
নির্জন আমার হাসিজনাকীর্ণ করো—দাও একা
ভূত ভবিষ্যৎ স্মৃতি স্বপ্ন মনপবনের নাও।

১৮৮ যাও, উত্তরের হাওয়া ॥ অরুণকুমার সরকার

যাও, উত্তরের হাওয়া, তাকে গিয়ে ব'লে এসো, আছে
বসন্তের সম্ভাবনা পত্রহীন বিশুষ্ক শাখায়;
যদিচ ফড়িং নেই, মৌমাছি বা, আনাচে-কানাচে
এখনো হরেক রং প্রজাপতি নিত্যই বেড়ায়।
সে যেন ভাবে না গ্রীষ্ম একাধিক আসে না জীবনে;
বালুকা-আচ্ছন্ন নদী, ধ্যানমগ্ন, মৃত কি তা ব'লে ?
পারে না রুখতে কেউ ভাবনার অঝোর শ্রাবণে
প্রবল আক্ষেপে যার পঙ্গুও পাহাড়ী পথে চলে।
কী আছে যুবতী-দেহ সাড়া দিক কিম্বা না-ই দিক !
আমার অপরাজেয় অযোনিজ বীর সন্তানেরা
সমুদ্রে খাটায় তাঁবু, মরুবক্ষে বাঁধে স্নিগ্ধ ডেরা
সত্যকে সাজিয়ে করে সুন্দরের মতন অলীক।
যাও, উত্তরের হাওয়া, তাকে গিয়ে ব'লে এসো, আছে
যৌবনের ধনুর্বাণ লুকানো ইচ্ছার শমীগাছে।

১৮৯ তর্জনী ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো···কখনো বলবে না···
কাকে··· তুমি ভয় দেখাও কাকে···
আমি অনায়াসে সব ভেঙে ফেলতে পারি··
মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারি সবকিছু···
বাঁ পায়ের নির্দয় আঘাতে আমি সব
মুছে ফেলতে পারি··
তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো···কখনো বলবে না···

ভীষণ চমকিয়ে দিয়ে দশটার এক্সপ্রেস চলে গেল।
পরক্ষণে পৃথিবী নীরব।
তারের উপরে বাজে হাওয়ার শাণিত ভাষা, আর
মিলায় চাকার শব্দ···তর্জনী দেখিয়ে কেন··
তর্জনী দেখিয়ে কেন··
যেন বা হুড়মুড় শব্দে স্বপ্নের বাড়িটা
ভেঙে পড়তে গিয়ে টাল সামলে নিয়ে এখন আবার
অতল নয়নজলে জেগে রয়।

১৯০ একটি হত্যা ॥ রাম বসু

ও যেখানে পড়ে আছে রক্তপদ্ম ফুটেছে সেখানে।
জনহীন রাজপথ সংজ্ঞাহীন ট্রামের লাইন
এ পাশে নিষ্প্রাণ বাড়ি জড়সড় অন্ধকার মুখে
কয়েকটা পুলিসট্রাক, হেলমেট, রাইফেল, জীপ,
একটা শেলের শব্দ, মাটি ফেটে ধোঁয়ার নাগিনী
পাক খেয়ে উঠে পড়ে, শূন্যে দোলে চক্রময় ফণা।
রক্তাক্ত সে শুয়ে আছে পৃথিবীর সান্ত্বনার কোলে।

ওখানে রয়েছে শুয়ে গুলিবিদ্ধ একটা মানুষ
বুকে তার রক্তপদ্ম মুখে তার চৈত্রের পলাশ

অঙ্গ জুড়ে শান্ত নদী যন্ত্রণার গোলাপবাগানে
তাকে ঘিরে গাছ পাখি বসন্তের প্রকৃতি আকাশ।

একটা হত্যার রক্তে ভেসে গেল শহরের মুখ
চমকে নিভলো আলো। তারপর ঘন অন্ধকারে
তার খোলা চোখে এল আস্তে আস্তে ভোরের আকাশ
সেই চোখে চোখ রাখে এত সাধ্য ছিল না খুনীর।

ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই জয়ের সম্মান
সেখানেই সূর্য ওঠে, সেখানেই জেগে থাকে ধান।

১৯১ অনন্যোপায় ॥ সুকান্ত ভট্টাচার্য

অনেক গড়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল, ব্যর্থ বহু উদ্যম আমার,
নদীতে জেলেরা ব্যর্থ, তাঁতী ঘরে, নিঃশব্দ কামার,
অর্ধেক প্রাসাদ তৈরী, বন্ধ ছাদ-পেটানোব গান,
চাষীর লাঙল ব্যর্থ, মাঠে নেই পরিপূর্ণ ধান।
যতবার গড়ে তুলি, ততবার চকিত বন্যায়
উদ্যত সৃষ্টিকে ভাঙে পৃথিবীতে অবাধ অন্যায়।
বার বার ব্যর্থ তাই আজ মনে এসেছে বিদ্রোহ
নির্বিঘ্নে গড়ার স্বপ্ন ভেঙে গেছে; ছিন্নভিন্ন মোহ।
আজকে ভাঙার স্বপ্ন—অন্যায়ের দম্ভকে ভাঙার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্য পথ দেখি নাকো আর।
তাইতো তন্দ্রাকে ভাঙি, ভাঙি জীর্ণ সংস্কারের খিল,
রুদ্ধ বন্দীকক্ষ ভেঙে মেলে দিই আকাশের নীল।
নির্বিঘ্ন সৃষ্টিকে চাও? তবে ভাঙো বিঘ্নের বেদীকে,
উদ্দাম ভাঙার অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও চারিদিকে।

১৯২ এ গ্রামে একদিন ॥ লোকনাথ ভট্টাচার্য

এ গ্রামে একদিন মানুষের বসতি হবে, গাছপালা অর্থ
পাবে, যে কথা বলব তুমি-আমি, আমরা-তোমরা,

হবে তার দ্যোতনায় কোনো এক-অনেক অন্ধকার
রাত্রি মুখর।
কিছু কম অভিমান এ নয় যে-আমি কোণের, ময়লা
কাপড়ের, আজো পেলাম না স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে
একটা বসাব জায়গা একটি বটের বেদী, চিনি নি
নিশ্চিত করে কোনো তীর্থের পথ।
তবু আমায় কথা বলাবে বলেই বলি, ততটা তোমাব
মন রাখার জন্য নয়, যতটা তোমার প্রেমের প্রতি
আমাব এক অবশ অভ্যাসে।
হোক না অভ্যাস, প্রেম শব্দটা আওড়াতেও ভালো লাগে,
বলি বলেই কে জানে হয়তো আজো বেঁচে আছি—বাঁচতে
চাই আব কত সদ্য-জাগা ভোরে—জপেব মন্ত্রের মতো
'এ গ্রামে একদিন মানুষের বসতি হবে।'

১৯৩ মালী ॥ আলোক সরকার

কেবল একটি মালী সাবাদিন স্থির কর্মরত। রৌদ্রময়
সমস্ত সকালবেলা শিকড়ে শিকড়ে জল দেয়।
পাকা পাতা ছিঁড়ে ফেলে। একাগ্র তন্ময়
মলিন মাটির বুক ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কৃত করে। দুর্বল লতাটি
বেড়ার উপর রাখে। কিন্তু কোনোদিন
কোনো সাজি আনে না কখনো। শুধু পরিপাটী
বাগান সাজায়, ভাবে এ-গাছের থেকে
ও-গাছের দূরত্বের পরিমাণ। উজ্জ্বল রঙিন
ফুলগুলো গাছের শাখায় আর যখন-ই ঝরেছে
নিস্পৃহ প্রস্তুত ছুটে আসে, ঝরা ফুলগুলি
কোথায় যে ফেলে দেয় জানি নি কখনো। শুধু রাত্রিবেলা
নির্জন বাগানে দেখি দাউদাউ আগুন জ্বলেছে—
একটি নিঃসীম মালী শীত পোহায়, শান্ত অবহেলা

পাকা পাতাগুলি আনে, ঝরা ফুলগুলি আনে, দুই হাতে
মুঠো মুঠো ছুঁড়ে দেয় আগুনের ভিতরে অমোঘ।
তখন বাগান মূক নিস্পৃহতা, লাল ফুলে অনপেক্ষ মাতে।

১৯৪ ঈশ্বর স্তোত্র ॥ তরুণ সান্যাল

হাওয়ায় সমুদ্রে সূর্যে বালুতে ঢেউয়ের কোটি দাঁতে
যে দেবতা, তাকে নমস্কার
হরিণীর অতি কাছে বাঘের কোমল পদপাতে
যে দেবতা, তাকে নমস্কার
ওহে পাতা-ঝরা গাছ, তরুণী স্তবকে বিষফুল
ফোটালে যে দেবতা, প্রণাম
পুরুষের মৃত্যু হয়ে কে সে অস্ত্রবেঁধানো আমূল
যে দেবতা নারীতে, প্রণাম
এতো ঠিক মন্ত্র নয়, উচ্চারণ তবু উঠে আসে
ভরে দেয় অবিশ্বাসী বুক
হাঁটু ভেঙে বসি, ওকি আমারি অলক্ষ্যে কেন হাসে
নশ্বর বাতাস ধোয় মুখ
তারায় ছটফট রাতে আকাশে সাষ্টাঙ্গে একা শুয়ে
মন্ত্রহীন কে ধূলিধূসর
নদীর বিপুল স্রোতে ঝড়ের আঙুলে ফেনা ছুঁয়ে
কে ঈশ্বরী বুকে নিরীশ্বর
বায়ুতে সমুদ্রে সূর্যে শস্পে ওষধিতে বৃষ্টিপাতে
যে দেবতা তাকে নমস্কার
আগুনে অরণ্যে পশু পাখিতে নদীতে জ্যোৎস্নারাতে
যে দেবতা তাকে নমস্কার
তন্দ্রাজাগরণে এই আশরীর দুঃখের বিলাস
যে জাগালে, সে কোন ঈশ্বর
কোনো শুদ্ধিমন্ত্র নেই, ধ্যান নেই, না দীর্ঘনিশ্বাস
কে আমার হে কোন ঈশ্বর।

১৯৫ সাঁওতালি গান ॥ অনুবাদ : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

১. পরাণ হলো আগুন আমার পরাণ রাখি কোথায়
কাঠ কাটো হে বানাও ঘর পরাণ রাখো সেথায়।

২. পিপুল গাছে কোকিল ডাকে পথের শেষে। গরম কাল।
চাষের জমির নিচে পুকুর তাইতে ডাকে মন্দা ব্যাং
বাদলা দিনে। বর্ষাকাল।

৩. প্রথমে বলেছ রাখবে আমায় দশটি বছর
স্মরণ করবে কুড়িটি বছর আরো ~
কোথায় গেল সে দশটি বছর কোথায় গেল সে কুড়ি
এক বছরেই ছেড়েছ আমায়, চলে গেছ তুমি।

৪. জন্ম নিলাম আমি আদিবাসী কাজ করি হেসে হেসে
ও ভাই, আমি তো পড়তে জানি না লিখতেও না
উঁচু ভাঙা জমি কেটে করি সমতল
যদিও বুনেছি প্রচুর ধান
তবুও সেসব পাবে না কখনো ছেলেরা আমার।

১৯৬ গঙ্গাযমুনা ॥ শঙ্খ ঘোষ

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের
আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার
আর সবই থামা থেমে-যাওয়া চোয়ালে-চোয়াল-জাগা উচ্চাশার ঝুল লাগা
নেমে যাওয়া ভাঙা বর্ষার প্লাবনশেষে ম্যানহোল থেকে তোলা অস্ত্রময়
ভয় আর ধ্বস্তদেহ ফেলে রেখে ছুটে যাওয়া টায়ার টায়ার
ব্রিজ ধ্বস্
আর সবই শহরের কবিতা, কেবল এইটে প্রান্তরের।

আর সবই মৃত্যুর কবিতা, কেবল এইটে জীবনের

আর সবই আমার কবিতা, কেবল এইটে তোমার
এইটে উপচেপড়া পূর্ণ টান সমুদ্রের কী কী যেন বাকি ছিল ব্যথা দেওয়া হল
কাকে অকারণে একদিন হাঁটুজল ভেঙে চলে যাওয়া বসন্তের উড়ো চুল
হাসাহাসি করে লোকে নিচু হয়ে বুকে নেওয়া সমস্ত পথের ধুলো
হাজার হাজার পাতা উড়ে যাওয়া আসন্ন ঈশান
আর সবই গঙ্গার কবিতা, কেবল এইটে যমুনার।

১৯৭ একটি ঘুমের টেরাকোটা ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ট্রেন থামলো সাহেবগঞ্জে, দাঁড়ালো ডান পায়ে।
ট্রেন চললো। থার্ড ক্লাসের মৃন্ময় কামরায়
দেহাতি সাতজন
একটি ঘুমে স্তব্ধ অসাড় নকশার মতন ;
এ ওর কাঁধে হাত রেখেছে, এ ওর আদুল গায়ে ;
সমবেত একটি ঘুমের কমনীয়তায়
গড়েছে এক বৃত্তরেখা, দিগ্বধূর স্তন ;
পোড়ামাটিব উপর দিয়ে আকাশে রথ যায়।

১৯৮ ভালোবাসা পেলে সব ॥ শক্তি চট্টোপাধ্যায়

ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো
যেদিকে দুচোখ যায়—যেতে তার খুশি লাগে খুব।
ভালোবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সান্ন খাবো
যা খায় গরিবে, তাই খাবো বহুদিন যত্ন করে।
ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত মুগ্ধকারী
আবরণ খুলে ফেলে দৌড় ঝাঁপ করবো কড়া রোদে
'উল্লুক' আমায় বলবে—প্রসন্নতাপিয়াসী ভিখারী—
চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়, লাথি মারবো পোঁদে।
ভালোবাসা পেলে জানি সব হবে। না পেলে তোমায়
আমি কি বোবার মতো বসে থাকবো ? চিৎকার করবো না,
হৈ হৈ করবো না, শুধু বসে থাকবো, জব্দ অভিমানে ?

ভালোবাসা না পেলে কি আমার এমনি দিন যাবে
চোরের মতন, কিংবা হাহাকারে সোচ্চার, বিমনা—
আমি কি ভীষণভাবে তাকে চাই ভালোবাসা জানে।

১৯৯ শব্দার্থ ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এখন ইস্কুল বন্ধ, বালক সীমান্তে যায় চাল কিনতে
চালের বাজারে বড় খুনসুটি, চালের ভিতরে বহু হাত
চোখও নিশ্বাসময়, পাথর ও কীট-ভরা, তবুও সুগন্ধ,
বালকের ভীরু হাত থলি খোলে, চেয়ে দেখে ওজনের কাঁটা—
জলস্থল অন্তরীক্ষ আগ্রহে প্রত্যক্ষ করে বালকের সুশিক্ষার দৃশ্য
পুলিশকে সিকি দিতে তারাই শিখিয়ে দেয়, ওপরে চাপায় সজনে ডাঁটা

মেঠো পথে ফিরে আসে। সুবোধ বালক, তুমি ও চাল খেয়ো না,
বিক্রি করো, কিলো-তে আটানা লাভ, সেই ভালো, শোনো,
চাল হলো শব্দ, কিন্তু তার অর্থ জেনে নিয়ে হাতে না তুললে
শিক্ষা অসমাপ্ত থাকে। শব্দ নয়, অর্থই তো শিক্ষার মহিমা।
এখন ইস্কুল বন্ধ, তবু দিন দিন বাড়ে বালকের সুশিক্ষার সীমা।

২০০ তোমার হাতে ॥ আল মাহমুদ

তোমার হাতে ইচ্ছে করে খাওয়ার
কুরুলিয়ার পুরনো কই ভাজা;
কাউয়ার মতো মুন্সীবাড়ির দাওয়ায়
দেখবো বসে তোমার ঘষামাজা

বলবে-নাকি, এসেছে কোন গাঁওয়ার?

ভাঙলে পিঠে কালো চুলের ঢেউ
আমার মতো বোঝে নি আর কেউ,
তবু যে হাত নাড়িয়ে দিয়ে হাওয়ায়
শহরে পথ দেখিয়ে দিলে যাওয়ার।

২০১ স্মৃতিস্তম্ভ ॥ আলাউদ্দিন আল আজাদ

স্মৃতির মিনার ভেঙেছে তোমার? ভয় কি বন্ধু, আমরা এখনো
এক কোটি পরিবার
খাড়া রয়েছি তো। যে ভিৎ কখনো কোনো রাজন্য
পারে নি ভাঙতে
হীরের মুকুট নীল পরোয়ানা খোলা তলোয়ার
খুরের ঝটিকা ধুলায় চূর্ণ যে পদপ্রান্তে
যারা বুনি ধান
গুণ টানি আর তুলি হাতিয়ার হাপর চালাই
সরল নায়ক আমরা জনতা সেই অনন্য।
ইটের মিনার
ভেঙেছে ভাঙুক। ভয় কি বন্ধু, আমরা জাগরী এক কোটি পরিবার।

২০২ অভিজ্ঞতা : জন্মভূমি বিষয়ক ॥ মানস রায়চৌধুরী

এসে বসে আছি খুব ভোর থেকে না-জমা বাজারে। পরিপাটি
শব্জির ঝুড়ির পাশে, অনিশ্চিত প্রথম ক্রেতাটি
হাত মেলে আছি কাছে, অনাদি অসীম শূন্যে তবু গ্রহণীয়
ফসল, কর্পূর ক্ষোভ তীব্র মানবীয়
সংভরণে করতল পূর্ণ হয়েছে কি?
যথেষ্ট আনি নি বিত্ত, তবু আকিঞ্চন ভরে নেবো এই পণ
আযৌবন করেছি লালন
আযৌবন অত্যন্ত প্রত্যূষ থেকে তোমার ক্ষেতের চারিধারে
সঘন শ্রাবণ বারিধারে
অথবা ফাল্গুন রৌদ্রে উচ্ছৃত, আশ্বিনে খালেবিলে
পণ্যে কই মুঠো ভরে দিলে?
জনসমাগম দ্রুত বেড়ে ওঠে কথা বলাবলি দরদাম
কারা খুব মুনাফায় বেচে দেয় আলুর গুদাম
কারা হায় হায় করে ফিরে যায় বিকেলের ট্রেনে
স্মৃতি কি তাদের মুখ চেনে।

খুব ভোরবেলা থেকে অপেক্ষায় রয়েছি স্পন্দিত
হাতে শুধু স্বেদক্ষরণের মায়া, ধুলো শুধু জমে
ধুলোর ভিতরে দিন অফুরান রয়েছে চিহ্নিত
জাগে নি কিছুই, আলো জাগতিক লক্ষে, অর্থাগমে
সারাটি দুপুর হবে হিসাবনিকাশ। আমি প্রথম ক্রেতাটি
একমাত্র ফিরে যাবো, মুঠোভরা অশ্রুভেজা মাটি
অস্ফুট কুয়াশা থেকে আলো-জ্বলা সংসারে তোমার
এই অভিজ্ঞতা হতে থাকে বারবার।

২০৩ যখন দাঁড়াই ॥ বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত

যখন আমরা দাঁড়াই প্রতিবাদের জন্য রাস্তার সামনে
সূর্য দুটুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে
আর আমাদের পায়ের নিচে শিরশির করে ওঠে শিরা
শিরা ঢুকে পড়ে মাটির ভেতর পাথরের ভেতর
যখন দাঁড়াই রাস্তার সামনে রাস্তা উঠে যায়
পায়ের তলা ছাড়িয়ে অনেক অনেক উঁচুতে
আস্তে আস্তে পাথর হয় পা, পাথর হয় হাত
পাথর হয়ে যায় আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস
পাথর হয়ে যায় কথা বলা পাথর হয়ে যায়
তোমার চোখের জল পাথর হয়ে যায় মনে পড়া, আর
পাথরের কানে ভেসে আসে স্বর—আমরা মানুষ নই
আমরা মানুষ ছিলাম না কোনোদিন
পাথরের চোখ দেখতে পায় প্রতিবাদের বদলে
শুরু হয়েছে অশেষ যুদ্ধ আর সমস্ত দিন সমস্ত রাত
তোমার আমার মাঝখান দিয়ে উড়ে যায় টোটা
উড়তে থাকে মাথার উপর টোটা
আমি কি শুনতে পাই টোটা ছোঁড়ার শব্দ
তুমি কি শুনতে পাও টোটা ছোঁড়ার শব্দ
ক্রমাগত যা উড়ে চলেছে দুজনের ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে।

বিচার ॥ মণিভূষণ ভট্টাচার্য

খেতখামার ছেড়ে দিয়ে তামা রোদ ডালপালায় জাল পেতে রাখে।

উত্তরে ইটখোলা থেকে ঝুড়ি ও কোদাল কাঁধে ফিরে আসে নির্মল মেয়েরা,
ক্ষুধায় কাহিল সন্ধ্যা হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে মহাজন-রজনীর ডাকে,
কুপির আলোয় খোলে খেজুর পাতায় ঘেরা কুলিদের ডেরা,
চুরুট, ফোলিও হাতে আতরের গন্ধখানি দেখা দেয়—
খুদের জাউয়ের সঙ্গে মিশ খায় সুদ বাদে অর্ধেক মজুরি,
দাঁতে-দাঁত ঘষা কিছু মরদ বাতাস ছিল, বাতাসে শানানো ছিল ছুরি।

সিল্কের পাঞ্জাবি লোটে চাটাইয়ের ডানপাশে, রাত্রি জ্বলে সোনার বোতামে
কবজির ডায়ালে কাঁপে আমিষাশী রেডিয়ম, সংবিধান ভিজে যায় তেজারতি ঘামে,
দুচোখে গড়ায় জল শব্দহীন, ভারতমাতার বুকে নখের আঁচড় আর
অনন্ত দেহাতি হাহাকার—
বাঁকানো চাঁদের ফণা নেমে গেছে ততোধিক বাঁকা এক নদীর ওপার—
দুভাঁজ অশোকস্তম্ভ ওৎ পেতে বসে ছিল তেলচিটে বালিশের পাশে
আংটির পাথর-সাঁটা নির্বাচনী থাবা জুড়ে সংসদীয় শান্তি নেমে আসে।

ওঁ শান্তি। হাওয়া যায় টলমল বাবুর পেছনে, আর যায় রাত্রি ভোরের চৌকাঠে
কেবল ছত্তিশগড়ি উল্লাসে মেয়েরা দেখে কর্তার ঘচাৎ মুণ্ড
পড়ে আছে দক্ষিণের মাঠে।

২০৫

তিন পয়সার পালা / একটি গান ॥ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহীন্দ্র ॥ এই ফাঁকেতে ভদ্দর বাবু শুনুন দিয়ে মন
আপনাদেরই সামনে কিছু আছে নিবেদন।
পাপীতাপী ঢের লোকই যে নেই তাতে সন্দেহ
কিন্তু তাদের ভাত জোটে না জানেন কি তা কেহ?
ভর পেটটাকে খাইয়ে দিয়ে তবে দেবেন জ্ঞান
জ্ঞানে দেখুন কাজ হয় না লাগেই পুলিশ ভ্যান।

শরীরটাতো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে?

মহীন্দ্র ॥ মানুষ তবু বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি,
লোক ঠকিয়ে লোক পিটিয়ে কেঁদে ককিয়ে
চুরিচামাবি করেই বাবু ভরে সবাই থলি
মানুষ জাতি নিজের জ্ঞাতি এই কথাটাই ভুলি!

নেপথ্যে ॥ অতএব মহাশয় শুনুন দিয়ে মন

সকলে ॥ বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ করুন—নন্।

পরিচায়িকা

কবিতা ১ ধান ছাড়া বাঙালির আত্মা বাঁচে না। তাই ধানভানা ঢেঁকিকে নিয়ে মন্ত্র। বাংলা পুরাণে যন্ত্রটি নারদের বাহন। শব্দটি মুণ্ডারি। ঢেঁকি যার ধান উনান গোরু সন্তান এয়োস্ত্রীও তার। ব্রতের মন্ত্র মেয়েলি, সেখানেও পিতৃতান্ত্রিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা। ন্ত-যুক্ত পদ ক-টি বিশেষণ অথচ ক্রিয়ার কাজ করছে। ধরনটি পুরোনো। বাংলা ভাষারও উৎপত্তি এরকম বস্তুগত বিনিময়ের সূত্রে।

২ এ জাতীয় বচন বাংলা ওড়িশা আসামে চলতি আছে। বেদের উষাস্তোত্রের সুন্দর মহিমা এর মধ্যে নেই। নিষ্প্রদীপ গ্রামে কাজের চাকা ঘোরে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত অবধি। উষাপ্রদোষের আচ্ছন্নতা তবু স্পষ্ট ফুটেছে।

৩ ধাই-হরিণীর লোভ দেখিয়ে হরিণকে ফাঁদে ফেলার ছবি। ছবিটি বাকৃপ্রতিমায় পরিণত। একদিকে হরিণ-হরিণীর সংলাপ, আরেকদিকে শিকারী ভুসুকু ও তার শিকারের সংলাপে গানটি নাটকীয়। হরিণী হরিণকে নাম ধরে ডাকছে, বাংলা সমাজ ও ব্যাকরণে ব্যাপারটি নতুন। নিজের মাংসে হরিণ নিজের শত্রু—যৌনতাভিত্তিক শোষণ আছে এবং প্রবাদটি আজও আছে। 'তরঙ্গ' শব্দে হরিণের লাফ বাঁধা পড়েছে, যামিনী রায়ের পটে যেমন ঢেউয়ের মতো হরিণের ছবি। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এ হরিণ মায়াহরিণ। এই একটি আর্কিটাইপ।

৪ পউআখাল বাংলার পদ্মানদী। ভুসুকু বাঙালি হলো, একথায় বাঙালি সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত আছে। এগারো শতকে চোলদের নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে বিধ্বংসী এবং রাজেন্দ্র চোল বাংলা ওড়িশা জয় করেছেন। এই ধ্বংসলীলা জাতিধর্মের ভিৎ নাড়িয়ে দিয়েছে, ভুসুকুরা চণ্ডালিনী গ্রহণ করছেন। এঁরা ধনী, জাতিভেদ অমান্য করা এজন্য এঁদেরি পক্ষে সম্ভব।

৫ দায়িত্বজ্ঞানহীন সন্ন্যাসধর্মের উপর এর চেয়ে বেশি তিরস্কার আর হয় না। চৈতন্য-র আগেও এদেশে এরকম ঘটতো। প্রথম প্রসব গর্ভপাতে

পরিণত, এদিকে মেয়েটিকে স্বামী ছেড়ে গেছে। তখন ধারালো পাথর দিয়ে নাড়ি কাটা হতো, কঞ্চি ব্যবহারের ফলে ক্ষত দূষিত হওয়ায় এখনো এদেশে বহু প্রসূতির মৃত্যু হয়। কবিতাটির ভাষা মেয়েলি'।

৬ কবিতাটির ভাষান্তরে স্বাধীনতা নেওয়ার দরকার ছিল। গুমঘাট হলো গুল্ম-ঘাঁটি। বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে সীমান্তরক্ষী থাকতো না, গুল্ম ছিল স্থানীয় থানা। উদাসীন গ্রাম থেকে শুল্ক আদায় এর কাজ ছিল। বনের পারে আর নদীর ধারে এরা থানা গেড়ে বসতো। বৈষ্ণবপদাবলীর দানখণ্ড নৌকাখণ্ড পালায় কৃষ্ণের অত্যাচারের বীজ আছে এখানে। কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনী এদের জন্য ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তুর্কদের বঙ্গবিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

৭ বাংলার প্রথম বিয়ের গান। পরে মঙ্গল কবিতার সঙ্গে এই ধারা মিশে যায়। মঙ্গলকাব্যে বরযাত্রা, বিয়ে এসবের বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এবং এই কবিতার মতোই অনেক দেশীয় বাজনার নাম আছে। বিয়ের নাচ গানের এই রীতি উপজাতিদের থেকে এসেছে। এই কবিতারও প্রসঙ্গ ডোমনিবিয়ে। জয়জয়কার শব্দটি এখনো পূর্ববঙ্গের উপভাষায় জোকার। পশ্চিমবঙ্গেও উলুর এই আনুষ্ঠানিক মূল্য স্বীকৃত। উচ্চবর্ণের নীচসংসর্গ এখানেও মেনে নেওয়া হয়েছে। কবিতা ৪ দেখুন।

৮ আদিবাসী শবররা এখন শাওরা নামে পরিচিত। মধ্যভারতের শবরদের নিয়ে এলুইন গবেষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়াতে এঁদের বাস। চর্যাগানে এঁরা এসে পড়েছেন এবং অস্ট্রিকভাষী হলেও এঁরা আর্যভাষা ব্যবহার করেন। রোমান্টিক কবিতা রূপে শবর শবরীর প্রেমের এ গানটির মূল্য নির্দেশ করা যায়।

৯ শবরশবরীর নাচের মাতাল ছবি পাহাড়পুরে মন্দিরের গায়ে সমকালে ধরা পড়েছে। শবরের প্রেম ও মৃত্যু এ গানে এক সূত্রে বাঁধা। নারীর সামনে পুরুষকে বলি দেওয়া আদিবাসীদের উর্বরতাবৃদ্ধির জন্য একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কাংনিধান ও কার্পাসের উল্লেখ আছে এ কবিতায়। মরলে শেয়ালকুকুর কাঁদবে, প্রবাদটি এখনো প্রচলিত।

১০ বুদ্ধবাদী হেইআন যুগের একটি ছোটো নিটোল জাপানি কবিতার মতো এই প্রকীর্ণ চর্যাটি। কবিতা ১১ দেখুন।

১১ গীতগোবিন্দের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলেও বহুস্তর বিশিষ্ট অর্থগূঢ় এই শ্লোকটি একটি ভাবঘন জাপানি হাইকুর মতোই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষ্ণ,

রাধা, নন্দ আর রাধার সখী—নানাজনের উচ্চারণ এখানে মেঘের বৃক্ষচ্ছায়ার আসন্ন রাত্রির যৌনতার এবং মন্দ্রধ্বনির অন্ধকারে মিলেমিশে গিয়েছে।

১২ পনেরো শতকের ফরাশি কবি ফ্রাঁসোয়া ভিয়োঁব লেখা বিলাপগাথা মনে পড়ে : দুটি রচনাতে ভঙ্গি আধা-গম্ভীর, চিত্রণ বস্তুগত ও নিরাসক্ত।

১৩ দ্রুত অলজ্জ সংলাপ চালনায় এবং পরিবেশনির্ভর প্রত্যুৎপন্ন উপমাচয়নে এ কাব্যের লোকায়ত স্বভাব স্পষ্ট। তাম্বুলদান প্রণয়প্রস্তাবের প্রথম ধাপ।

১৪ বিরহের কোনো বৈষ্ণব ছক নয়, পরিশুদ্ধ বেদনা এ কবিতায় লিরিক সুর এনে দিয়েছে। নিসর্গের পটে মানবিক আনন্দবেদনার ছবি ধরে রাখার রেওয়াজ আছে আদিবাসীদের মধ্যে। বারোমাস্যা, চৌমাস্যার ছক তৈরি হয় এর থেকে এবং তা মঙ্গলকাব্যের মতো আখ্যানের মধ্যে মিশে যায়।

১৫ গোপরা গোরক্ষক এবং গোপালক। গোকুল তাঁদের কমিউন। কংসরাজার অত্যাচারে এবং করের দায় এড়াতে তাঁরা সকলে অন্যত্র চলে যান। জাতিবর্ণপ্রথা এখানে সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করে। সমকালীন মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে এমন নমুনা আছে। মধ্যযুগের বাংলায় শ্রেণী-ধর্মঘটের এই একটি দৃষ্টান্ত। বর্ণনাটি চলচ্চিত্র-ধর্মী, রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' রচনার অংশ মনে করিয়ে দেয়।

১৬ পুতনারাক্ষসীর বস্তুগত বর্ণনাকে অতিক্রম করে তুলনাগুলি এক অধি-বাস্তবতার সৃষ্টিশীল জগতে চলে যায় এবং চিত্রণের এই কৌশলে পুতনা আরো বাস্তব হয়ে ওঠে।

১৭ প্রথম প্রেমিকের রূপানুরাগ ও কামনাকারতা পদটিতে সুন্দর ধরা পড়েছে। তবে কবিতাটি লোকজীবননির্ভর প্রেমের কবিতাই, রাধাকৃষ্ণ প্রণয়ের দার্শনিক বিড়ম্বনা এর মধ্যে নেই।

১৮ পদটি চৈতন্যচরিতামৃতের উদ্ধৃতি থেকে নেওয়া। পুরোনো ধ্রুবা রীতির গানের এই একটি ভালো নিদর্শন। রচনাটি শীলাভট্টারিকার শ্লোকের মতোই বিধুর অথচ সংরক্ত।

১৯ মধ্যযুগের ভক্তিসাহিত্যের ভক্তি একদিকে যেমন প্রভুর প্রতি ভৃত্যের নির্বিচার আনুগত্য তেমনি অন্যদিকে শাসক পুরুষের কাছে নারীর নিঃশর্ত আত্মনিবেদন।

২০ রাজা দশরথ অন্ধমুনির সন্তান হত্যা করলেন, ঘটনাটি মূল রামায়ণে পরে সংযোজিত হয়েছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে তা গৃহীত হওয়ায় বাঙালি মানসিকতার করুণানির্ভর নীতিবোধের দিকটি ফুটে উঠেছে।

২১ অহল্যা উদ্ধারের গল্পটি মূল রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত। এবং বর্তমান অংশটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংযোজন। পাটনীর কথায় অলৌকিকতাবিমুখ সন্দেহবাদী বাঙালিব লোকায়ত জীবনদৃষ্টির স্পষ্টতা।

২২ আকবরী রৌপ্যমুদ্রায় রামসীতার বনগমনের এ দৃশ্যটি উৎকীর্ণ আছে। এবং এই সময় হিন্দু ও মুসলমান, সামন্ততন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের নিবিড়তম অভিগমের প্রহর।

২৩ রামায়ণে রাক্ষস আখ্যানের মধ্যে জটায়ুর প্রতিরোধী ভূমিকাটি পুরোনো। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই আপ্রাণ প্রহরা বাঙালির ভক্তির একটি শর্ত।

২৪ শুধু রামায়ণের যুগে নয়, অগ্নিপরীক্ষা ভারতের মধ্যযুগেও একটি সামাজিক পরীক্ষা।

২৫ কবিতাংশটি অনুবাদ হয়েও মৌলিক রচনা হয়ে উঠেছে, দৈত্যরাজারানির প্রতি কবির দৃষ্টি নেতিবাচক নয়, বরং বেশ সাম্প্রতিক মানবিক।

২৬ কৃষিনির্ভর বাংলাদেশে নিশ্ছিদ্র ঘর লোহার হওয়াই স্বাভাবিক। কাবণ লোহাই হলো একমাত্র সুলভ ধাতু কৃষিকার্যে যার একান্ত প্রয়োজন। শ্রমের কাব্যমূল্য এখানে স্বীকৃত কিন্তু হিন্দুসমাজে তখন কামারদের উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি ছিল না। তাঁরা গোরুর চামড়া দিয়ে হাওয়া দেবার ভাঁটি তৈরি করতেন।

২৭ চাব পণ কড়ি খরচের পরিকল্পনার মধ্যে সদাগরের ভোগবাদী চরিত্রের পরিচয় সুন্দর ফুটেছে। মনসার বিধানে তার মাথার কাঠ সাপ হয়ে যাবে একটু পরে, মনসার খলখল হাসি বিজয়গুপ্তের বিবৃতির মতোই সহজ এবং নিষ্ঠুর।

২৮ বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রেমের বীর্যে অশঙ্কিনী নারীর আত্মঘোষণার সুবটি এত স্বাভাবিক অথচ এমন নির্ভয় হয়ে আর কোথাও বাজে নি।

২৯ চৈতন্য দুঃখীর নাম সুখী করে দিলেন, কিন্তু তাতে দুঃখীর দুঃখ ঘুচবে না। অথচ চৈতন্যভক্তদের ভূমিকা এখানে আধুনিক স্তাবকদের মতো। ব্রাহ্মদের সময় থেকে বাংলায় সুন্দর নামকরণের প্রতি উন্মুখতা স্পষ্ট। মধ্যযুগে বাঙালির নামকরণ অনুষ্ঠান একটি ধর্মীয় ও প্রাসঙ্গিক ব্যাপার ছিল মাত্র।

৩০ বাঙালির অভিনয়ের প্রথম ঐতিহাসিক ও অনুপুঙ্খ উল্লেখ পাওয়া গেল এখানে। কোটালের ভূমিকা সরস এবং যোগসূত্র রক্ষার কাজ করেছে। চৈতন্য এখানে নারী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তিনি রাধাভাবে ভাবিত, তাঁর ভক্তদের একদলের সাধনা সখী সাধনা। আজও কৃষ্ণযাত্রায় ছেলে মেয়ে সাজে।

৩১ বাংলার এ ছবির সঙ্গে কাংড়া ছবির প্রসঙ্গ ছাড়া আর কিছুর মিল নেই। দিগন্ত বিস্তৃত সূর্যস্নাত সমতলের মানুষ বাঙালির কাছে নিসর্গের কোনো আলাদা মূল্য থাকার কথা নয়। তবু গোধূলির আবেদন বিশিষ্টভাবে বাঙালি এবং ছবিটি ধ্বনি ও রঙে একাকার। উত্তরগোষ্ঠের এই চিত্র বাংলা কবিতায় একটি আর্কিটাইপ হয়ে উঠেছে।

৩২ সাহিত্যে চোরের মাও বড়ো গলায় কেঁদে থাকে। কিন্তু রাধা কাঁদতে পারে না। অথচ এ ধরনের মোক্ষণ ভাবালু বাঙালির ভারসাম্য রক্ষার একটি মূল শর্ত। ধর্ষকামনা ও মর্ষকামনার টানাপোড়েনে কবিতাটির বুনুনি তৈরি।

৩৩ ছবি ও কবিতার সহযোগের নমুনা বাংলায় বেশি নেই। গোবিন্দদাসের এ পদটি অবনীন্দ্রনাথের প্রথম দেশি ধরনে আঁকা ছবি 'শুক্লাভিসার-'এর প্রেরণা হয়েছিল। বাংলার চিত্রশিল্পের একটি বড়ো মোড়বদল হলো এখান থেকে।

৩৪ ভক্তদের কাছে চৈতন্য রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ। কিন্তু তাঁর ছেলেখেলার মধ্যে কোনো অলৌকিকতা নেই। বহুবিবাহ ও স্বামী স্ত্রীর বয়সের ব্যবধানের প্রসঙ্গটি এ সময় উল্লেখযোগ্য।

৩৫ খৃষ্টের মতো চৈতন্যও সর্বত্র পেলব নন, কোথায় কোথাও পরুষ, পেশল। বিদেশির শাসকের নির্দেশ অমান্য করে নগরসংকীর্তন ১৪৪ ধারা অমান্যের মতোই। ঘটনাটি অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আগে ঘটেছে। কীর্তন এখানে গণযোগাযোগের একটি মাধ্যম।

৩৬ স্থিতিস্থাপক পয়ারের ছন্দোবন্ধন যে দুরূহতম দার্শনিক তত্ত্বকেও সাবলীলভাবে ধরে রাখবার উপযুক্ত আধার হয়ে উঠেছে উদ্ধৃত অংশটি তার প্রমাণ। কৃশ্চান ধর্ম ও দর্শন মধ্যযুগে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, ভারতে তা নয় বলেই এসব অংশ চোখে পড়ে।

৩৭ চৈতন্যব সমকালীন বাউলদের দেখতে শুনতে কেমন ছিল, এ অংশটি সে তথ্য জানার সবচেয়ে পুরোনো দলিল।

৩৮ গানটি ভালো ব'লে এটি শেখর নয়, বিদ্যাপতির বলা হয়। রবীন্দ্রনাথও তাই বলতেন। তিনি এ গানে নিজস্ব সুর দিয়েছিলেন। বিরহ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে এ কবিতার শব্দচিত্রে। কবিতা ১১ দেখুন।

৩৯ এ গান এমনিতেই আন্তরিক। ভক্ত ও ভগবান এখানে কেবল জড়িত নন, সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত সমস্যা ব'লে এ আত্মজিজ্ঞাসা সৎ, মর্মস্পর্শী।

৪০ রবীন্দ্রনাথ শেক্‌সপিঅরের ফলস্টাফ আর ভাঁড়ুদত্তের অমর নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করেছিলেন। মুকুন্দর যথাযথ অথচ বাস্তব এবং সরস চিত্রণের জন্য শুধু নয়, এ ধরনের ভণ্ড মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কৃষি-নির্ভর বাঙালি সমাজে উল্লেখযোগ্য ব'লেও ভাঁড়ুদত্তদের চেনা দরকার।

৪১ ফুল্লরার বারমাস্যার এ অংশ অনভিজাত লোকসাহিত্যরীতির উপর ভিত্তি ক'রে রচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের বসন্ত সম্পর্কিত শিষ্ট সংস্কার এখানে ভেঙে গেছে, ক্ষুধা আর ক্ষুধাই ফুল্লরার আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব। এখানে ফুল্লরা তার ভাবী সতিনের কাছে দুঃখের কথা বাড়িয়ে বলছে, এরকম ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু তাতে দারিদ্র্যসীমার নিচের অধিকাংশ বাঙালির সাম্প্রতিক ক্ষুধা-নিষ্পীড়নের ঘটনাটি মিথ্যা হয়ে যায় না। কামচেতনা ফুল্লরার ক্ষুধাবোধের আনুষঙ্গিক—নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রসঙ্গটি তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতা ১৪ দেখুন।

৪২ চাল ধার করতে এসে সই সইয়ের মাথার উকুন বেছে দিচ্ছে—ছবিটি সরাসরি বাংলার লোকজীবন থেকে তুলে নেওয়া।

৪৩ বাংলা কবিতায় প্রসববেদনা বর্ণনায় কোনো ট্যাবু নেই, অন্যত্র আছে। বাংলা কবিতার আদিম চরিত্র এতে বাধা দেয় না, কল্যাণবোধের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের মিলন ঘটলো কিনা তা নিয়েও ভেবে দেখে না। জ্যামিতিক চাপ ও খাড়া টানে গর্ভবতীর ছবি যেমন ফোটে, এ কবিতার টানটোন তেমনি অভ্রান্ত, সহজ। শারীরিক যন্ত্রণা একটি সত্য ঘটনা এবং তা এই রচনার বিষয়। পরিতোষ সেনের সগর্ভ মেয়ের নান্দনিক ভান ফুল্লরার সঙ্গতভাবেই নেই।

৪৪ মুকুন্দ হয়তো লৌকিক জীবনে ঘুমপাড়ানি গান শুনেছেন, বা তার সংস্কার ঘটিয়েছেন। অনুকৃত আঙ্গিকের উপর মুকুন্দর নিজস্ব আঙ্গিক শেষ-পর্যন্ত শিল্পসার্থকতা পেয়েছে।

৪৫ খুল্লনা ছেলে খুঁজতে বেরিয়েছেন। পুত্রহীন লহনার ক্ষোভ, ক্রোধ

বিচিত্র ক্ষতমুখ দিয়ে বোন/সতিনের উপর গিয়ে পড়ছে। এই দাহ, বেদনার অশ্রুপাত, যৌনতা নিষিক্ত তুলনা দ্রুতলয়ের ছড়ার ছাঁদ এই সবই মেয়েলি গঞ্জনাকে চিহ্নিত করেছে। কবিতা ৫ দেখুন।

৪৭ নদীমাতৃক খরাপীড়িত বাংলার অনেক আচার অনুষ্ঠান জলের সঙ্গে সম্পর্কিত। জলখেলার এই অনুষ্ঠানটি মেয়েদের, এখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। চট্টগ্রামের মতো প্রান্তিক অঞ্চলে এখনো এ জাতীয় খেলা চালু আছে। বাংলার শরৎ বা বসন্তউৎসবের কাদাখেলার আচারের সঙ্গে এর মিল আছে। সংস্কারটি উচ্চারিতভাবে অন্-আর্য।

৪৯ রামায়ণে রামের হরধনু ভঙ্গের মতো অর্জুনের লক্ষ্যভেদের বিষয়টি মহাভারতে গুরুত্বপূর্ণ। পরে এই মনোযোগকে যোগের সঙ্গে যুক্ত করে আধ্যাত্মিক তাৎপয দেবার চেষ্টা হলেও ধনুর্বাণের ব্যাপারটি মূলত আদিবাসী জীবনসংক্রান্ত।

৫০ য়োরোপের ফিউডাল অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের পার্থক্য হলো এখানে যে এদেশে গ্রামের অব্যবহিত প্রয়োজন মেটানোর পরও কিছু উৎপাদন উদ্বৃত্ত থাকতো। নারকোল তার মধ্যে একটা পণ্য। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যের মধ্যে তাই নারকোল উল্লেখযোগ্য। উপকূলভাগের বাণিজ্যে নারকোলের মৌল ভূমিকা থেকে গেছে। শব্দটি মালয়েসিয় এবং নারকোল দেখে রাজার যে বিস্ময় ইবনবতুতার বিস্ময় তার চেয়ে কম ছিল না। বাঙালির পূজা অর্চনায় নারিকেলের অশাস্ত্রীয় ব্যবহার চোখে পড়ে।

৫১ প্রাণের রহস্য সম্পর্কে বিস্ময়বোধ ছিল সেকালেও। অভিচারমন্ত্র মধ্য-যুগে বিজ্ঞানের সূত্রেব মতো কাজ করতো। বিষ ঝাড়ানোর মন্ত্রের ঐতিহ্য খুবই আদিম। ছাপাখানার যুগেও লাল কাগজ বিষ ঝাড়ার মন্ত্র মুদ্রণের পক্ষে প্রশস্ত।

৫২ প্রসঙ্গটি বাঙালির কৌম চেতনার গর্ভ থেকে উঠে এসেছে। তীরে এসে ভাইরা ডাকছে, বেহুলার মতো বোন কঙ্কাবতী ভেসে চলেছে, বাঙালির উপকথায় এই প্রসঙ্গটি আছে। এবং আছে একইরকম অন্নপ্রসঙ্গ। মেলানি মধ্যযুগের বাংলার একটি বিশিষ্ট শব্দ। এর অর্থ হলো সামাজিক সাক্ষাৎকারের সময় উপহারসামগ্রী দেওয়া।

৫৩ বাংলার সমাজ ও ইতিহাস এই মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। জড়বাদী

মাটির বন্দনা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে মধ্যযুগের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করেছেন।

৫৪ বিখ্যাত কবি আলাওলের কৃতিত্বের কোনো পরিচয় এ কবিতায় নেই। কিংবা আলাওলের কৃতিত্ব এখানে এই যে মধ্যযুগে বাংলার প্রত্যন্তের একজন কবি হয়েও এবং পৌত্তলিকতাবিরোধী মুসলমান হয়েও বৈষ্ণব রাধার অভিসারের ছাঁচে বাংলা কবিতাকে ঢেলেছেন।

৫৫ মহাভারতের কোরাসপ্রতিম নিরাসক্ত ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ বাংলায় বিগলিত হয়ে সকরুণ ব্যক্তিগত কান্নায় রূপ পেয়েছে। এই বাংলা ব্রজবুলি নেওয়ারীতে মেশানো। একদিকে তিব্বত অন্যদিকে বাংলা—তার মাঝখানে এ ধরনের রচনা যোগসূত্র তৈরি করেছে। নেপাল থেকে পাওয়া এ সব নাটগীতি প্রান্তিক বাঙালি সংস্কৃতি চর্চারও উদাহরণ।

৫৬ লেখা সতেরো শতকের, চোদ্দ শতকের ওড়িশার কোণারক ধ্বংসের কথা আছে এখানে। আদিবাসী/পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের মানুষের সৃষ্ট ইতিহাস তালগোল পাকিয়েছে। ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করছে—ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে মুসলমানবেশী হিন্দু দেবতা-দের যুদ্ধে পাঠালেন—তুর্ক বিজয়ের স্মৃতি এ রচনায় এভাবে সক্রিয়। প্রসঙ্গটি মানসিক চাপ তৈরি করেছিল, বাংলার লোক-উৎসবে কৃশ্চান আদিবাসীদের নাচ এমনি চাপ তৈরি করে। তাই এর কাব্যরীতিও ক্লিষ্ট। মহামদ মানে মহম্মদ।

৫৭ ধর্মঠাকুর সূর্যঠাকুরও। রূপরামের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে সূর্যের সঙ্গে তুলনা এসেছে। গুরুদেব ও দেবতাকে মিলিয়ে দিয়েছে এই অসচেতন সৌর আর্কিটাইপ। হিন্দুদের সূর্য কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত করেন আর ধর্মপূজার এলাকা কুষ্ঠরোগের এলাকা। ধর্মমঙ্গলে কুষ্ঠনিরাময়ের দেবতা সূর্যের মন্দির কোণারক ধ্বংসের উল্লেখ আছে। কবিতা ৫৬ দেখুন।

৫৮ গার্হস্থ্য চিত্রটি বাঙালি ধরনে যথাযথ ও সম্পূর্ণ এবং সমস্যাটি ও তার প্রতিক্রিয়া এখনো প্রাসঙ্গিক। রাজকন্যা রঞ্জাবতীর বিয়ের সমস্যা আজকের নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর বাঙালি মেয়ের বিয়ের সমস্যা।

৫৯ মদ, মাংস এবং নারীশরীর উপভোগের এই বর্ণনার মধ্যে যে স্বাস্থ্য ও প্রাণপ্রাচুর্যের পরিচয় আছে বাংলা কাব্যে তার তুলনা নেই। দ্রুতলয়ের মালঝাঁপ ছন্দের রীতিতে মত্ততার এই বেগ ও আবেগ সুন্দর

প্রকাশ পেয়েছে। মদ্যপায়ী কালুডোম অন্ত্যজ শ্রেণীর। কবিতা ৯ দেখুন। এবং শুঁড়িবাড়িও গ্রামের বাইরে। মদ গণতন্ত্র, বৃটিশ রাজতন্ত্রের মতো এই সামন্ততন্ত্রেও অতিরিক্ত শুল্কসাপেক্ষ একটি একচেটিয়া ব্যাপার।

৬০ বাঙালি নাকি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে। সুন্দরবনে বাঘে-মানুষে কোলাকুলি এখনো স্বাভাবিক এবং বাঘের দেবতা দক্ষিণরায়কে নিয়ে রায়মঙ্গল লেখা হয়েছে সতেরো শতকে। বর্ণনাটি গিলগামেশ প্রসঙ্গ বা হেরাক্লিসের সিংহহত্যার ভাস্কর্য স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে অবশ্য অস্ত্রের উল্লেখ আছে, আঘাত ও প্রত্যাঘাত আছে, কিন্তু প্রত্ন প্রতিরোধের পেশল দার্ঢ্য স্বাভাবিকভাবেই নেই। সিন্ধুসভ্যতায় বাঘের সঙ্গে যুদ্ধের শীলমোহরের মতো এই রচনাও আসলে অন্-আর্য প্রাণ-স্বভাবকে মুদ্রিত করে। যুদ্ধের দ্রুততা ও তীব্রতা ফুটিয়ে তোলার জন্য এখানেও মালঝাঁপ ছন্দের রীতি এসেছে। কবিতা ৫৯ দেখুন।

৬১ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সব দেশের রচনাতে আশ্চর্যরকমের মানবিক এবং প্রসঙ্গ হিশেবে নির্বাচনের উপযুক্ত। বাঙালির জীবনে যুদ্ধ নেই বললেই চলে। তবু যুদ্ধের অভিঘাতটি এখানে সত্যতর এজন্য যে এঁরা সকলে এক অঞ্চলের মানুষ। এবং এঁদের প্রতিরোধ নিষ্ক্রিয় নয়, এটিও লক্ষ্য করার মতো।

৬২ চোর নিছুটি বা নিদালিমন্ত্র পড়লে গৃহস্থ ঘুমিয়ে পড়ে, এই লৌকিক সংস্কারটি পুরোনো। ছড়াতেও ঘুম পাড়ানি গান আছে। এ ধরনের অভিচারমন্ত্র এত প্রাচীন যে অথর্ববেদেও এর স্থান আছে। অভয়ার বর পেয়ে চোর চুরির মন্ত্র পড়ছে। অন্নদামঙ্গলেও সুন্দর চুরি করছে দেবী কালিকার প্রসাদে। ইনি এখনো চোর-ডাকাতের দেবতা। কবিতা ৪৪ দেখুন।

৬৩ বাংলার এ বন্যা অলৌকিক নয় ঠিকই, আবার মনুষ্যসৃষ্টও নয়। এবং ছোটো বড়ো সকলকে এর ফলভোগ করতে হয়। কোনো বিপর্যয়কে তোমার-আমার পাপ ব'লে ব্যাখ্যা করার মধ্যে যে দুর্বল যুক্তিক্রমের পরিচয় আছে তা এর মধ্যে মধ্যযুগশোভন ভাবে নিহিত।

৬৪ আঠেরো শতকের এ সমস্যা বিশ শতকের শেষেও সামন্ত-ধনতান্ত্রিক এই দেশে তীব্র আকার ধারণ ক'রে আছে। কর্মহীন কবির মানসিক বিশ্লেষণও যথাযথ। এই আত্মধ্যান লোকায়ত কাব্য ধর্মমঙ্গলের একটি বিশিষ্ট শর্ত। কবি ব্যক্তি হয়েও এখানে শ্রেণীর প্রতিনিধি।

৬৫ কবিতা ৩ দেখুন।

৬৬ পার্বতীর প্রণতি থেকে শিবের দাপট পর্যন্ত সব অভিব্যক্তি বাঙালি পুরুষ-শাসিত মধ্যশ্রেণীর মানসিকতার ছাঁচে ঢালাই করা। মানুষের শ্রেণী-চরিত্র এক একটি বিশিষ্ট দেবদেবীর ছকে প'ড়ে যায়, গোর্কি এভাবে এ ধরনের টাইপ চরিত্রগুলিকে লক্ষ্য করেছিলেন। শঙ্খ পরার বিবরণ পরে তরু দত্তের একটি ইংরেজি কবিতার বিষয় হয়েছিল। শাঁখা বাঙালি বৌদের সবচেয়ে প্রিয় অলংকার। ব্রতনির্ভর বাংলার আল্পনায় শঙ্খ-লতাব অলংকবণ প্রায় দেখা যায়। শিব বিষাক্ত সর্পভূষিত, নীলকণ্ঠ এবং শঙ্খ বিষঘ্ন। স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের উভযোজ্যতা বা অ্যামবিভালেন্স শঙ্খ প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশিত। শাঁখারিটোলা নামটির মধ্যে এখনো গিল্ডের স্মৃতি সক্রিয়। মেদিনীপুর, বর্ধমান, ২৪ পরগণায় এখনো শাঁখারি জাতির সংখ্যা গরিষ্ঠতা। ধানচাষ আদি অস্ত্রাল উপজাতিদের থেকে বাঙালি সমাজে এসেছে।

৬৭ উর্বরতাব প্রসঙ্গটি এখানে বড়ো। শস্যের উৎপত্তি এবং যুবমনে কামোদ্রেক তাই সংলগ্ন ব্যাপার। বিশেষ ক'রে শিবায়নে এব তাৎপর্য আছে। এই শিব শিশ্নদেব এবং লিঙ্গ ও লাঙ্গল শব্দদুটি এক মূল থেকে এসেছে। কবিতা ৪১ দেখুন।

৬৮ চণ্ডীমঙ্গলেব কবি যখন বলেন, নিজে বিশ্বাস করেন বা প্রথাসিদ্ধ ভাবেও যখন বলেন যে দেবী তাঁকে স্বপ্ন দিয়ে লিখতে বলেছেন তখন কাব্যতত্ত্বের একটি সূত্র তৈরি হয় যে কাব্য প্রেরণালব্ধ। রামানন্দ যতীর কথা এর প্রতিবাদ এবং এ প্রতিবাদ মধ্যযুগে কাব্যসমালোচনার ধারাটিকে আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যায়।

৬৯ উনিশ শতকের প্রথমের দিক পর্যন্ত লায়লি মজনুর কেচ্ছা বাংলায় প্রচলিত ছিল। এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ প্রেমকাহিনী মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় বেশি নেই। ইসলামি কবিতা হলেও আরবিফারসি শব্দ এখানে জোর করে চাপানো হয় নি। বটতলার ছাপা থেকে সাধারণ বাঙালি এই প্রাচ্য ট্র্যাজেডির গল্পরসটুকু উপভোগ করেছে। আখ্যান-কাব্যের মধ্যে চিঠির একটি প্রকরণগত ভূমিকা আছে। বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে গেলেও চিঠির আঁটসাঁট আধারটি সুন্দরভাবে বক্তব্য ধ'রে রেখেছে।

৭০ হিন্দু লেখক ইসলামি কাব্যবিষয় গ্রহণ করেছেন। উল্টো উদাহরণের

জন্য কবিতা ৫৪ দেখুন। মহরমের সকরুণ ঘটনাটি পরে উনিশ শতকের বিষাদকবিতার ধারার একটি বড়ো প্রেরণা হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন-এর বিষাদসিন্ধুও এই প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ। সেমিটিক বীর্য ও বিষাদ আল্লার আসন টলিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা রাখে। বিপরীত চিত্রের জন্য কবিতা ৫৫ দেখুন।

৭১ ভিক্ষাবৃত্তি লাভজনক এবং ভারতের প্রাচীনতম একটি পেশা। বুদ্ধবাদী সন্ন্যাসীরা ভিক্ষু নামে পরিচিত। ধর্মের নামে এই ব্যবসায়টিকে শোধন ক'রে নেওয়ার প্রয়াস এখনো পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। অথচ খালি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় যে পেট ভরে না তা ভিখারি শিবের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট। শিবায়নের শিব ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে কৃষিকার্যে মনোযোগী হয়েছেন কবিতা ৬৭ দেখুন। কিন্তু বাংলার কৃষকরাও বছরের একটা বড়ো সময় ধ'রে কর্মহীন। শিবের অন্ন-সন্ধানে যেমন তেমনি চ্যাংড়া ছেলেদের রঙ্গরসিকতায় ঐহিক মেজাজ ফুটে উঠেছে।

৭২ নারীদের পতিনিন্দার প্রসঙ্গ সব মঙ্গলকাব্যে ফিরে ফিরে এসেছে। এই পূর্বানুবৃত্তির ফলে মঙ্গলকবিদের মৌলিকতার অভাবটা বড়ো হয়ে ওঠে নি, বরং এপিক ফর্মের প্রতি তাঁদের মনোযোগ ধরা পড়েছে। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে এই অনুকৃত আঙ্গিকটিকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সমকালের নারীদের দুর্ভোগ এই কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে। এই রচনার শেষ অংশে নিজেকে নিয়ে অনতি-স্নিগ্ধ শ্লেষ আছে এবং এই জ্ঞাননির্ভর শ্লেষের ভঙ্গি নিরপেক্ষ।

৭৩ মধ্যযুগের য়োরোপিয় সাহিত্যে গোলাপ যেমন ভারতীয় সাহিত্যে পদ্ম তেমনি একটি প্রতীকী ভূমিকা নিয়েছে। পদ্মের পদ্মত্ব ছাড়িয়ে আলংকারিক কবির দৃষ্টি পদ্মের কোমলতা লাবণ্য পবিত্রতা প্রভৃতির দিকে চলে যায়। একই মানুষের পদ্মের মতো চোখ মুখ হাত পায়ের পাতা হতে পারে ভারতীয় সাহিত্যে। কামসূত্রী রসজ্ঞরা পদ্মিনী নামে সুন্দর নারীদের একটি শ্রেণী নির্ধারণ করেছিলেন, ভারতচন্দ্র তাও জানতেন। তবু জরাজীর্ণ প্রথাসিদ্ধ অলঙ্কার ছুঁড়ে ফেলে তিনি এখানে পদ্মিনীর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী।

৭৪ রাজকন্যা বিদ্যা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়েছেন, রানি রাজাকে এই সংবাদ জানালেন। ভয় ক্রোধ ভালোবাসার মৌল মিশ্রণে অংশটিতে এমন স্থায়ী রং ধরেছে ভারতচন্দ্রের কবিতায় যার তুলনা নেই। রানির

কথা সনাতনী বাঙালিনির উচ্চারণ এবং এরকম গর্ভপাত যেহেতু এখনো এদেশে অনুমোদন পায় নি তাই তা আজও প্রাসঙ্গিক। সমস্যাটি সেদিন উচ্চশ্রেণীসংক্রান্ত, আজও মোটামুটি তাই।

৭৫ ফুল কামদেবের অনুষঙ্গে এমনিতে আসে। পুষ্পময় মূর্তি অলংকার রচনার ধরনটি প্রাচীন এবং এটি মালাকরদের শ্রেণীগত শিল্পকর্ম। কবিতাশিল্পের মধ্যে এ ধরনের চারুশিল্পনির্মাণের একটি অন্য আবেদন আছে যা অনেকটা সাম্প্রতিক চলচ্চিত্রে টি ভি দেখানোর মতো। পরে রাবীন্দ্রিক নান্দনিকদৃষ্টিতে এই মালাকর শিল্পকৈবল্যের প্রতীক হয়ে এসেছিল। কবিতা ৬৯ দেখুন।

৭৬ রবীন্দ্রনাথ যেমন কালিদাসের কালের নদী আর নগরীর নামের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পেয়েছেন এ অংশ থেকেও তেমনি পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বিষয়টি যেহেতু খাদ্যদ্রব্য, প্রয়োজন ছাপিয়ে সৌন্দর্যে ভ'রে ওঠা তাই এখানে আরো কঠিন। এবং সুন্দর রূপায়ণের দিকে উন্মুখতা থেকে অন্নদামঙ্গলের কবি এই অন্নতালিকা প্রস্তুত করেছেন। পূর্বেকার মঙ্গল-কাব্যে এ জাতীয় বর্গীকরণের একটি শুভংকর সামাজিক মূল্য ছিল, এখানে এই নামাবলী নিছক বিলাসিতা। রামায়ণে নীবারধানের গুচ্ছের সঙ্গে খেজুরছড়ার মিল খোঁজা হয়েছে, বাংলা খেজুরছড়ি নামটির মধ্যে কাছাকাছি দুটি তুলনা মিলে গেল। মাছ মাংস সঙ্গে না থাকলে ভাত সুষম খাদ্য নয় আর বাঙালির প্রধান খাদ্য ধানের এতো নাম থাকলেও বাঙালির শরীর ক্ষীয়মাণ। কবিতা ১ দেখুন।

৭৭ এই শাক্ত গান অনুবাদের সময় এর ঋজু সরলতায় এডোআর্ড টমসনের হোমরের স্তবগানের কথা মনে পড়েছিল। মায়ের উক্তি গানটিতে নাটকীয়তা এনে দিয়েছে। উমার মানবিক দিকটি এ অংশে বড়ো, তা তার অতিমানবিক মহিমা ছাড়িয়ে উঠেছে। কবিতা ৩১ দেখুন। উমার শৈশব ঘরে; কৃষ্ণের, বাইরেও। উমা খেলার পেলব সামগ্রী; কৃষ্ণের খেলা ও কাজ একাকার।

৭৮ বাঙালির দুঃখের মূল তথাকথিত রাজনীতিতে নয়, আরো গভীরে গূঢ় ও স্থায়ীভাবে নিহিত। একই বছরে বন্যা ও খরা; নিরক্ষরতা, বস্ত্রহীনতা অন্নহীনতার অসহ অবস্থা; অমেয় দারিদ্র্য। তবু দেওয়ালে পিঠ দিয়ে যুদ্ধরত কৃষিনির্ভর গ্রামের মানুষগুলির প্রতিবাদী চারিত্র রামপ্রসাদের এই দুঃখদ্রোহের মধ্যে নিজস্ব ধরনে ফুটে উঠেছে।

৭৯ কোনো তান্ত্রিক ভূমি নয়, মা ও মাটিকে যখন এরকম একসঙ্গে রামপ্রসাদ স্পর্শ করেছেন তখনি তাঁর ভাবকল্পনা তুঙ্গে উঠেছে। কৃষিকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টিশীল রূপায়ণে এই ভূস্পর্শমুদ্রার লাবণ্য। কালী এখানে আর্কিটাইপ। 'মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া' একই সঙ্গে বন্ধন ও মুক্তির উভযোজ্যতায় আক্রান্ত। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি আছে এ কবিতায়। কবিতা ৫৩ দেখুন।

৮০ আগমনী গান দুর্গাপুজো শুরুর আগে এখন আর বিশেষ শোনা যায় না। কিন্তু সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার চেহারা প্রায় একই রকম আছে: আইন উপেক্ষা ক'রে অল্প বয়েসে মেয়ের বিয়ে দেওয়া, বৃদ্ধের বালিকা-বিবাহ, স্বামীগৃহে বধূর উপর অকথ্য অত্যাচার কিছু পাল্টায় নি। কবি সঙ্গতভাবে মায়ের সুরে সুর মিলিয়েছেন।

৮২ কবিতাটি সাব্লাইমের সেই বোধ এনে দেয় মধ্যযুগের বাংলা কবিতায় যা সচরাচর মেলে না। এখানে নাচের আসল চরিত্র আদিম, তবু বুদ্ধবাদ পেরিয়ে এসে আকাশ আর তারাদেবীর রং একই নীলিমায় নীল।

৮৩ মিস্টিক কবির কথা অনেক সময় এমন প্রহেলিকা। এই ধাঁধা লোক-সাহিত্যের একটি অংশ। সৃষ্টির আদিতে ছিল বাক্: এই প্রাচীন ধর্মীয় অনুভব এখানে সুন্দর বাণীরূপ পেয়েছে।

৮৪ গোর্খবিজয়ে ধর্মপ্রচার আসল ব্যাপার হলেও না-ধর্মীয় এরকম কিছু কিছু মানবিক ব্যাপার কেমন ক'রে যেন বড়ো হয়ে উঠেছে। গেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না কিন্তু ভালোবাসা পাচ্ছে। এই যুগীরা মোটামুটিভাবে ২৪ পরগণার লোক।

৮৫ কামবোধ একটি কৃষিনির্ভর ব্যাপার। জঙ্গলের জীবনে শুদ্ধ যৌনতা আছে, কামতাড়না নেই। কবিতা ৮ দেখুন। গোর্খবিজয়ে এই কামনার চেতনা আছে। বুড়ো বয়সের লোলুপ অথচ অশক্ত ভীমরতির এটি একটি সুন্দব ছবি। ভিন্ন চিত্রের জন্য কবিতা ৮৪ দেখুন।

৮৬ মিস্টিক চেতনা এখানে বিজ্ঞানচেতনার একটি গ্রহণযোগ্য বিকল্প হয়ে উঠেছে। মানুষের জন্ম ও জীবনের রহস্য ও বিস্ময় নতুন যুগের মানুষের কাছে সবসময় প্রেরণার আকর হয়ে উঠেছে। কবিতা ৫১ দেখুন।

৮৭ চৈতন্যের সন্ন্যাসের সময় আপত্তি উঠেছিল তাঁর মা ও স্ত্রীর দিক থেকে। কবিতা ৫ দেখুন। এখানে আপত্তি এসেছে গোপীচন্দ্রের নিজের দিক

থেকে। নাথধর্মপ্রচারমূলক সাহিত্য হ'লেও এ প্রশ্নে কবির মূল্যবোধের সততা ধরা পড়েছে।

৮৮ গোলামকে ভাই বানানো ভক্তি-ধর্মের একটি প্রতিক্রিয়া। সেন্টিমেন্ট দিয়ে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ককে শোধনের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতনভৃত্য', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন,' বিভূতিভূষণের 'রূপো কাকা' প্রভৃতি রচনাতেও অনেক পরে পাওয়া যাচ্ছে।

৮৯ মিল/অমিলের জন্য কবিতা ১৭ দেখুন।

৯০ কবিতা ১৩ দেখুন।

৯১ সহসা ব্যালাডের এমন সংরক্ত সাহসী অবসান বাংলা কবিতায় বিশেষ চোখে পড়ে না। গোর্কির 'মাকার চুদ্রা' গল্পের ট্র্যাজিক পরিণামেব কথা প্রায় অবিকল স্মরণ করিয়ে দেয়।

৯২ তীব্র সংবেগে এ কবিতায় লাবণ্য ঘনিয়ে এসেছে এবং লোকসাহিত্যে তা এসেছে এদেশে ইংরেজিপ্রভাবিত রোমান্টিক যুগ শুরু হবার আগে।

৯৩ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সুফীবাদ, মুসলমান কবি ও হিন্দু পুরাণের প্রসঙ্গ, নির্ধারিত কাব্যভাষা ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষা, শ্যামের বাঁশি ও কলের গান এখানে একাকার হয়ে গিয়েছে। অন্তত কালীকীর্তনের প্রচারে ও প্রসারে বাংলায় কলের গানের ভূমিকা কম নয়।

৯৪ এ লালু আর নন্দলাল দুজনের মধ্যে কার লেখা বলা শক্ত। টপ্পা ঢঙের এই কবিগান ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় উদ্ধৃত করেছিলেন। বৈষ্ণব কবিতার মেজাজে লোকায়ত অনুভবের স্থূল/সূক্ষ্ম প্রকাশের জন্য ১৮শতক থেকেই এ ধরনের গান বাংলায় জনপ্রিয়। কবিতা ৪২ দেখুন।

৯৫ কবিগানের মধ্যে রামবসুর এ জাতীয় বিরহ গানের তুলনা নেই বলা চলে। এ বিরহ বৈষ্ণব কবির বিরহ নিশ্চয় নয়। কবিতা ৩৮ দেখুন। তবু সৎ সহজ মানবিক আবেগের প্রকাশে গতিময় এসব গানের সারল্য ও বাস্তবতার প্রশংসা করতে হয়। বাংলা কবিতায় প্রথম স্তবকের অনতিনিরূপিত আভাষ পাওয়া গেল এসব রচনা থেকে।

৯৬ টপ্পা এক ধরনের ছোটো হালকা বিচিত্র স্বভাবের সংহত জীবন্ত ও রঙিন ভালোবাসার গান গাওয়ার রীতি। এই বিদেশি পরিভাষাকে আঠেরো উনিশ শতকের বৈঠকি মেজাজে আত্মস্থ করে রেখেছিলেন নিধুবাবু, রামনিধি গুপ্ত। তাঁর গান অনেক ক্ষেত্রেই অশ্লীল নয়, অনৈতিক নয়,

আবেগের গাঢ় বাস্তবতায় উচ্চারিত এ সব গানে একধরনের সহজ ভাব অথচ সূক্ষ্মতা আছে।

৯৭ লালন নাম না বললেও লালনের রচনাকে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর স্কেচ এঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে মনে রেখে ফাল্গুনীর অন্ধ বাউলের ভূমিকা নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ভাবপ্রেরণা সরাসরি লালন থেকে এসেছে একথা ভেবেছেন কেউ কেউ। এঁর গান প্রায় লোকসাহিত্য। দুশো বছরের পুরোনো এই মানুষটি প্রাণের গভীর কথাকে প্রাণের গভীর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ধর্মীয় শোষণ ও সামাজিক অবিচারে যাঁর অনাস্থা এ গান তাঁরই লেখা। এজন্য পুরুত মোল্লা মৌলবীরা তাঁর বিরোধিতা করেছেন, কিন্তু মানুষের জন্য তাঁর এ অন্বেষণ ফুরোয় নি। পুরুত মোল্লাদের বিরোধিতার কারণটি মূলত আর্থনীতিক, লালনরা তাঁদের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি ক্ষয়ের কারণ হয়েছিলেন।

৯৮ আগডুম বাগডুম॥ যোদ্ধা ডোমদের স্মৃতি এখানে সক্রিয়। এটিতে বিয়ের গানের অনুষঙ্গ থাকতে পারে। কবিতা ৭ দেখুন। এখন ডোমরা তফশীলভুক্ত জাতি। চর্যাগানের সময় সমাজে এদের ভিন্ন ভূমিকা ছিল। তেল হলুদ, সগোত্র বিবাহে নিষেধ এরকম অনেক লৌকিক আচার বাঙালিরা এই আদি অস্ট্রালয়েড নরগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার থেকে পেয়েছে, তেমনি এদের ভাষার অনেক শব্দ বাংলা ভাষাকে ঋদ্ধ করেছে।

খোকা ঘুমালো॥ মিল/অমিলের জন্য কবিতা ৪৪ দেখুন। নিদালিমন্ত্রের ব্যবহার বাঙালি জেনেছে আদি অস্ট্রালয়েড উপজাতিদের কাছ থেকে। কবিতা ৬২ দেখুন। এই ছড়ার পিছনে ১৭৪২-৪৩ এর বর্গীর হাঙ্গামায় উৎপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের পট আছে এবং গঙ্গারাম দত্তের মহারাষ্ট্রপুরাণ ছাড়া বাংলা ছড়া কবিতায় এই ঐতিহাসিক ঘটনার আর উল্লেখ খেদজনকভাবে নেই।

আমপাতা জোড়া জোড়া॥ সাহেবদের চাবুকের রামলাল শ্যাম-লাল এরকম জোড়ানাম থাকতো এবং নীলকুঠির সাহেবদের সে চাবুক ঘোড়া এবং মানুষের পিঠে সমান তালে আছড়ে পড়তো। হিংস্রতা ও যৌনহিংস্রতার টানাপোড়েনে ছড়াটি বোনা। ইংরেজি শব্দের অবিরল সপ্রতিভ ব্যবহার লক্ষ্য করার মতো।

৯৯ ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের ঈশ্বরের নাম নিয়ে খেলার প্রবণতা এবং পরমপিতা ঈশ্বরের থেকে জননী জন্মভূমির কোলে চলে যাওয়ার ইহমুখী প্রবৃত্তি স্পষ্ট।

১০০ কবিতা ৫৯ দেখুন। শোষণের সামাজিক-আর্থনীতিক চিত্রটি নতুন একটি রূপকের মাধ্যমে অসচেতন কবির হাতে কাব্যরূপ পেয়েছে।

১০২ কাঞ্চীকাবেরী ষোলো-সতেরো শতকে ওড়িয়া ভাষায় লেখা একটি ইতিহাসনির্ভর কাব্য। পুরুষোত্তমের এই কাব্যটির স্বাধীন ভাবানুবাদ ক'রে রঙ্গলাল বাংলা-ওড়িয়ার যোগসূত্রটি স্পষ্ট করেছেন। অশ্বারোহী গোপালিনীর এই প্রসঙ্গটি রাধাকৃষ্ণকথার ওডিয়া রূপ এবং ওড়িশার গৃহভিত্তিতে এখনো এই ছবি উৎকীর্ণ থাকে। রঙ্গলালের রচনায় স্খলিতবাস মাণিকাগোপিনীকে উপলক্ষ ক'রে ইন্দ্রিয়ময় প্রণয়চেতনার আবেশ তৈরি হয়েছে।

১০৩ এপিক কাব্যরচনার প্রথা অনুযায়ী মধুসূদন কাব্যপ্রেরণার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে আবাহন করেছেন। পূর্বসূত্রের জন্য কবিতা ৬৮ দেখুন। বিহারীলালের সারদামঙ্গল এই প্রেরণাস্বরূপিণীকে আবাহনের পরিপূরক ধারা এবং তা পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা ভাবনায় মিশে যায়। বাংলা কবিতায় সৃষ্টিপ্রণালীর রহস্য উদ্‌ঘাটনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সনদ এই অংশটুকু। প্রথাগত প্রেরণার উল্লেখ এবং এ কাব্য রচনায় মধুসূদনের পরিশ্রমও প্রস্তুতি স্বীকারের বুনুনিতে এ আবাহন বোনা। পণ্ডিতদের প্রবন্ধে পাদটীকার যে কাজ উল্লেখমূলক চিত্রকল্প এখানে তার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয়। মধুচক্রের প্রকৃতিনির্ভর চিত্রকল্পটি ছিল হোমরের রচনায়। ভর্জিল এই বাক্‌প্রতিমায় তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে প্রকাশ করেছিলেন; ভর্জিলের পিতা ছিলেন মৌমাছি সংগ্রাহক। ভর্জিল কার্থেজের শ্রমিকদের সঙ্গে এই মধুচক্রের মৌমাছিদের তুলনা করেছিলেন। পরে মিল্টন এ উল্লেখটিকে উল্লেখযোগ্যভাবে ব্যবহার করেন। গুড়ের অনুষঙ্গ জড়িত গৌড়জন বা বঙ্গবাসীর উল্লেখ এবং মধুসূদনের নিজস্ব নামে লাঞ্ছিত বাক্‌প্রতিমাটি মধুসূদনের প্রতিভার মৌল পরিচয় বহন করছে। শ্রম/প্রেরণার উভযোজী সংশ্লেষে ছবিটি মধুসূদনের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক সূচক।

১০৪ এ সন্ধ্যা বাঙালির নিজস্ব আর্কিটাইপ। চরণাশ্রয়ের বদলে চরণাশ্রমের নস্টালজিয়া লক্ষ্য করার মতো। মণি, রত্ন, ধন প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে

নিসর্গচিত্রটি পরিশীলিত হয়ে উঠেছে। একটি চিঠিতে এ অংশের সংগীতব্যঞ্জনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মধুসূদন মিল্টন ও শেক্‌সপিঅরের রোমানটিক সন্ধ্যাবর্ণনার উল্লেখ করেছিলেন। তবু এ সন্ধ্যা বিশেষভাবে বাংলার, এ বর্ণনায় মধুসূদনের বিশিষ্টতা। তারার বাক্‌প্রতিমাটি মধুসূদনের কবিতায় অবিরল ব্যবহৃত হয়ে তাঁর কাব্যবৃত্তের একটি নতুন দিক নির্ণয়ের সুবিধা করে দিয়েছে।

১০৫ প্রমীলাকে কেউ ঝাঁসির রানি ভেবেছেন; বীর্য ও কামনার মিশ্রণ অসংগত হয়েছে, বলেছেন অন্য কেউ। এ সবই বাড়াবাড়ি। অশ্বারোহী প্রমীলার একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিতে চেয়েছেন মধুসূদন এবং প্রয়োজনে প্রমীলার বুকে উরুতে পাঠক/দর্শকের চোখ টেনে এনেছেন। দৃশ্যটি চলচ্চিত্রধর্মী এবং আইজেনস্টাইন এ অংশের চিত্রনাট্য তৈরি করতে পারলে সম্ভবত খুশি হতেন।

১০৬ রাক্ষসদের এ প্রেম মানবিক। কবিতা ২৫ দেখুন। অধিকন্তু য়োরোপিয় কবিতার রোমানটিক প্রেম-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এর মধ্যে। এ উক্তি আদি মানবীর প্রতি আদিম মানুষের উক্তি এবং এখানেও মিল্টনের কবিতার ছায়া আছে। প্রেমের স্বাভাবিক মানবিক প্রকৃতিকে ভাষা দেওয়ার জন্য মধুসূদন নিসর্গ প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু তাঁর প্রবণতা কুসুমশয়নের সঙ্গে স্বর্ণমন্দির মিলিয়ে দিয়েছে, ঊষাকে হৈমবতী বানিয়েছে। কবিতা ১০৪ দেখুন। লোকায়ত অভিজ্ঞতার পরিশীলিত প্রকাশেই মধুসূদন বিশিষ্ট।

১০৭ বড়লাট মেয়ো আন্দামান দ্বীপে বেড়াতে গিয়ে ওয়াহাবী কয়েদির ছুরিতে নিহত হন। সেই মৃতদেহ প্রিন্সেপ ঘাট থেকে ময়দানের রাস্তা দিয়ে লাট-সাহেবের বাড়িতে আনা হয়। এই শোকযাত্রার সমারোহ মধুসূদনকে সম্ভবত স্পর্শ করেছিল। দুপাশে সশস্ত্র সারিবদ্ধ শোকাবনত মন্থর সেনাদল, আট ঘোড়ার ধীরতম গতি, য়ুনিয়ন জ্যাক ও পুষ্পস্তবক ঢাকা শবাধার এবং শোকোচ্ছ্বাসের মূর্ছনার অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে এই সর্গে। শুধু এই ক্যাথলিক শোকযাত্রা নয়, কলকাতায় তৎকালীন মুসলমানদের মহরমের বিরাট বর্ণাঢ্য সামরিক শোকযাত্রা এমনকি সেদিনকার পার্শী শোকযাত্রার দৃশ্যও খুব সম্ভব এ ধরনের চিত্রণের উৎস ছিল। মধুসূদন তামাশা দেখতে ভালোবাসতেন এবং মিল্টনের মতো তাঁর এপিকের মূল্যনির্দেশ সমকালের সময় ও সমাজের পটে হতেই পারে।

১০৮ মানুষ আর প্রকৃতির সম্পর্ক এখানে সুদূর নয়। এ প্রকৃতি মানবিক। শুধু ধ্বনিবিজ্ঞানের একটি সূত্রের প্রয়োগ রূপে না, প্রতিধ্বনির ব্যবহার মধুসূদনের ব্যঞ্জনাবাদী সাহিত্যে বারবার ফিরে এসেছে। বাংলা কবিতা স্তবকভাগে স্পষ্ট ও যথাযথ হয়ে উঠলো এখান থেকে'।

১০৯ একদিকে অমিত্রাক্ষর ছন্দোরীতির অমিল প্রবাহ, নিষ্ক্রিয় বাংলাদেশে নীলধ্বজের দেশে ক্রিয়াশীল নামধাতুর অবিরল ব্যবহার, এমনকি প্রতিশোধ-নেবার-ইচ্ছা পদবন্ধটিকেও প্রতিবিধিৎসা-য় সংহত ও অমোঘ করে আনা, পুত্রহন্তা অর্জুনের প্রতি ক্রোধ, ক্রোধ ক্ষোভ স্বামী নীলধ্বজের দিকে—আর অন্যদিকে মা জনা স্ত্রী জনা রানি জনার কেবলি ভেঙে পড়া কান্নায়, আর্তিতে, কাব্য-অনুচ্ছেদে: দুইয়ের বুননে এ কবিতার টানটান নকশা তৈরি। এ আর্তি-ক্রোধ সত্য এবং সমান সত্য এবং এখানেও তাঁর পুরাণ ভেঙে গড়ার সার্থকতা। কবিতা ৭০ দেখুন। মহাশ্বেতা দেবীর হাজার চুরাশির মা উপন্যাসের কথা প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ে।

১১০ বিদেশে ব'সে বাংলাভাষায় কবিতা লিখতে গিয়ে এক বাঙালি-কৃশ্চান কবির খাঁচার মধ্যে দেশিপাখির রোদনভরা গানের কথা মনে পড়েছে। যে অনিকেত মনোভাব মধুসূদনকে সন্ধেবেলা ঐতিহ্যের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলো এ কবিতাতেও সে দ্বন্দ্ব আর উত্তরণের সংবাদ আছে।

১১১ বাংলায় সনেটের প্রকরণটিকে ইংরেজদের এক উপনিবেশের কবি মধুসূদন সরাসরি ইতালি থেকে অর্জন ক'রে এনেছিলেন। এবং এ কবিতার পিছনে আন্তর্জাতিক পটভূমি ব্যাপ্ত। ইতালির মহাকবি দান্তের জন্মের ছ-শো বার্ষিকী উৎসব হচ্ছে সেবছর। মধুসূদন তাঁর প্রিয় কবিকে প্রসঙ্গ ক'রে এ সনেটটি রচনা করলেন আর সেই সঙ্গে ফরাসি এবং ইতালিয় ভাষায় কবিতাটির অনুবাদও ক'রে পাঠালেন। ইতালির সম্রাট ভিক্তর ইমানুয়েল এই লেখা ও অনুবাদের সপ্রশংস প্রাপ্তিস্বীকার করেছিলেন। বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে উপনিবেশের ভাষা বাংলার অধিকার এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১১২ মধুসূদন ভারতভূমি এবং বঙ্গভূমিকেও কবিতার বিষয় ক'রে নিতে পেরেছিলেন। মননের এই ঔদার্য বাংলা কবিতায় ক্রমশ কমে এসেছে।

১১৩ ফরাসি কবি লা ফঁতেনের এরকম কিছু নীতিধর্মী কবিতার অনুবাদ করেছিলেন মধুসূদন। নীতিগর্ভ হলেও এ জাতীয় ক্লাসিক কবিতার

আঙ্গিকগত আবেদন এখনো ফুরোয় নি। এই সেদিনও সমিল গদ্য-কবিতার একটি পরিমার্জিত প্রকরণ আয়ত্তে আনার জন্য মেরিঅ্যান মুর ফঁতেনের অনুবাদ করেছেন। কবিতা ৬৫ দেখুন।

১১৪ এক একটি নিটোল বিপুল দুপুর বাঙালির প্রাত্যহিক অর্জন। অথচ দিবানিদ্রাকাতর বঙ্গবাসী এর বিরাট বিবাগী সুরে সুর মেলাতে পারেন না।

১১৬ 'জামাইবারিক' প্রহসনে জামাইদের গান। শান দেওয়া শ্লেষের আপাত-অসংলগ্ন আঘাতে দীনবন্ধু একটি ধর্মীয়-তাত্ত্বিক মুখোশ ছিঁড়ে ফেলেছেন। পুরোনো পদ্ধতি ও নতুন প্রসঙ্গের সংঘর্ষে এই শ্লেষ আরো জোরদার।

১১৭ বিজ্ঞানের বিবর্তনবাদের সঙ্গে পুরাণের দশমহাবিদ্যাকে মিলিয়ে দিয়ে একটি নতুন মূল্যনির্দেশ করতে চেয়েছিলেন হেমচন্দ্র। গতির বেগ ও আবেগ কবিতাটিতে সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

১১৮ ক্রোধ এ কবিতায় এক মহাজাগতিক আয়তন পেয়েছে।

১১৯ বিজ্ঞান ও পুরাণ, শ্রম ও প্রেরণার সহযোগী অথচ প্রতিবাদী সম্পর্ক কবিতাটিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে।

১২০ নুনের মতো দেশলাই বাঙালি জীবনের এক আবশ্যিক ইন্ধন। দেশি দেশলাই তৈরির সমসাময়িক প্রয়াস ও ব্যর্থতার প্রসঙ্গ আছে রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে। বিলেতি দেশলাই ও স্বদেশি স্তোত্রের টানাপোড়েনে ব্যঙ্গ ছাড়াও একটি আলাদা নকশা এ কবিতায় ফুটে উঠেছে। কবিতা ১১৬ দেখুন।

১২১ কবিতা ১১৫ দেখুন।

১২২ ইন্দ্রনাথের মক-এপিক ভারতউদ্ধার কাব্যের পঞ্চমসর্গ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের মধুসূদনের অনুগত। যুদ্ধ বাংলার পুরাণে তেমন নেই, আধুনিকেও নেই। বাংলার গ্রাম যুদ্ধের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় এবং নগরে অসিযুদ্ধের বদলে মসীযুদ্ধ।

১২৪ পলাশীর যুদ্ধ কাব্য থেকে উদ্ধৃত। নবীনচন্দ্র প্রথম সংস্করণে প্রভুর বদলে ম্লেচ্ছ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। রঙ্গরসিকতা নয়, তবু বীররসের কাব্যেও বাঙালির নিজস্ব স্বভাবটি ধরা দিয়েছে। কবিতা ১২২ দেখুন।

১২৬ উনিশ শতকের বাংলা কবিতার পুঞ্জিত বিষাদ ভেঙে এই প্রতিভার উৎসার। ১১৫, ১২১-এর কবিতায় আছে এই অন্ধকারের ছবি।

মানুষের জন্মের মতো প্রতিভার জন্মও কবিতার বিষয়। কবিতা ৮৬ দেখুন। এর একদিকে প্রতিভা সম্পর্কে রহস্য ও বিস্ময়ের বোধ অন্যদিকে বিজ্ঞান-মনস্কতায় সৃষ্টিপ্রণালীর উদ্‌ঘাটন। এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে বাংলার উনিশ শতকের উত্তরণ।

১২৭ বিজয়চন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনের অন্ধকার ছায়া পড়েছে এ কবিতায়। তবু এও উনিশ শতকি আলোয়-আসা গান।

১২৮ বঙ্গবাসীকে গান শোনাতে এসে উপবাসী কবি খালি পেটকে সারিন্দা বা গোপীযন্ত্রের খোলের সঙ্গে তুলনা করছেন। হাঙ্গার-আর্টিস্ট গল্পটি অনুষঙ্গে মনে পড়ে যায়।

১২৯ রবীন্দ্রনাথের ছবির অন্ধকারে উদ্‌ভিন্ন রজনীগন্ধা যেমন উন্নমিত শাদা তেমনি মধ্যশ্রেণীর বাঙালির রসরুচির পটে রজনীগন্ধার সত্যতর নান্দনিক প্রতিষ্ঠা।

১৩০ কবিতা ১২৯ দেখুন। নান্দনিক দৃষ্টিকোণ এখানেও তীক্ষ্ণ। পুণ্যবোধের উপর সৌন্দর্যবোধের জয় এমন সরলীকরণ নয়, বরং র‍্যাফেলের ধর্মনির্ভর ছবির উল্লেখ এনে কবিতার আরেকমাত্রা শ্রী বাড়িয়ে দেওয়া হলো।

১৩১ এ কবিতার প্রবল আত্মগত স্বরারোপের সঙ্গে ১২৬-এর কবিতার তন্ময় উচ্চারণের তুলনা করুন।

১৩২ প্রাকৃতিক বিপযয় মহিলাকবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বোধকে নিবিড় এবং তীব্র করে তুলেছে।

১৩৪ কবিতা ১৩২ দেখুন। পুরী যাওয়ার পথে তীর্থযাত্রীদের নিমজ্জন নিয়ে লেখা কবিতার অংশ। অনুরূপ প্রসঙ্গ নিয়ে রচিত হপ্‌কিন্সের দি রেক অফ দি ডায়েটশলাণ্ড কবিতাটি মনে পড়ে যায়। ধর্মীয় কবি হপ্‌কিন্সের কবিতাটি ট্র্যাজিক বিনষ্টির মহিমাকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। আর রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে একান্তভাবে মানবিক এবং স্পষ্টতই ঈশ্বরদ্রোহী এই একটি কবিতা লিখে বাংলা কবিতায় নতুন বাক্‌ নিয়ে আসেন।

১৩৫ পরশপাথর কবিতার শেষ স্তবক। ক্ষ্যাপা এক পরশপাথর খুঁজে ফেরে। কখন একবার পেয়েও হারায়, কখন তা সে নিজেই জানে না। পেয়ে হারানোর, হারিয়ে পেতে চাওয়ার এক নতুন অস্তিত্ববাদী পুরাণ রচনা করেছেন এখানে রবীন্দ্রনাথ। কামুর সিসিফাসের মিথের ব্যবহার মনে করিয়ে দেয়।

১৩৬ মন্দির ছেড়ে যেতে বলার অনুনয়ে এ কাব্যাংশ শুরু, মন্দির ছেড়ে যেতে বলার আদেশে এই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। এর মধ্যে জয়সিংহের আত্মদান একটি আর্কিটাইপের মর্যাদা চায়।

১৩৭ মালার্মে ঊষরতাকে তাঁর কবিতার বিষয় ক'রে নিয়েছিলেন। কবিতা লেখা না-লেখা এখন অনেক সাম্প্রতিক কবিতার প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের মতো অবিরলভাবে বহুপ্রসূ কবিও একসময় বছরের পর বছর কবিতা লেখেন নি। ঊষরতার প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় সমাধুনিক তাৎপর্য পেলেও তা স্বাভাবিক, কেননা শিল্পীপ্রকৃতিকে তিনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিসর্গ-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ভালোবাসেন।

১৩৮ ভারতীয় ট্র্যাজেডি-ভাবনার এক আশ্চর্য পরিচয় এতে বিধৃত।

১৩৯ কবিতা ১৩৭ দেখুন। ইংরেজি অনুবাদে এ গানটি একটি আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত পেয়েছে। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ কখনো লরেন্সকথিত রুক্ষ নগ্ন প্রত্যক্ষতায় ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। তারো আগে, রবীন্দ্রনাথের এ কবিতা প'ড়ে স্পেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের দুই বড়ো কবি হিমেনেথ ও য়েটস আধুনিক ঋজু নিরাভরণ কাব্যরীতিপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা পান।

১৪০ মহাবিশ্বে মানুষ নিঃসঙ্গ কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে আজ বিজ্ঞানীরাও ভাবছেন। এ জিজ্ঞাসা মহাবিশ্বের এই ধ্যান রবীন্দ্রনাথের পূজাগানকেও একটি আন্তর্জাগতিক পটভূমিতে স্থাপন করে, এতে প্রকারান্তরে মানবতার মহান মহিমাই প্রতিষ্ঠিত। ফলে গানটিতে ধ্রুপদী সুর লেগেছে। কবিতা ৮২ দেখুন।

১৪১ শ্রেণীগত ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার বোধ রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টত পীড়া দিয়েছে—কোনো দার্শনিক বিড়ম্বনার মধ্যে না গিয়েও এটুকু বলা চলে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রনাথকে একজন নিরক্ষর সাঁওতাল জানেন না এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে জানেন না। এই অজ্ঞতা পারস্পরিক এবং এই অজ্ঞতা এই জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ আমি তোমাদেরি লোক বললেও একজন লোকের সঙ্গে তাঁর অসেতুসাধ্য দূরত্ব থেকেই যায়।

১৪৩ ভারতের জাতীয় সংগীত এই প্রথম স্তবকটি। এটি নিছক ব্রাহ্মগানরূপে রচিত হয়েছিল। এর পিছনে বৃটিশরাজের বন্দনা নেই একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। তবু ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে গানটি জড়িত হয়ে

থাকলো। অভ্যস্ত ব'লে এর সংহতি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তরীতির উপর এর ছন্দ নির্ভরশীল—ব্যাপারটিকে এই সংহতির একটি পদ্ধতিগত প্রমাণ ভেবে নেওয়া যায়। অন্য ভাষায়, যেমন রুশভাষায় গানটি যদি গাইতে হয় তাহলে এর কাব্যপ্রকরণটি ভেঙে দেওয়া ছাড়া কিন্তু উপায় নেই।

১৪৪ শুধু বুর্জোয়া সমাজের অন্যায়ের নয়, এ সমাজে শিল্পীর অন্যায় ভূমিকার সমালোচনাও রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। এটি তাঁর শেষ উল্লেখযোগ্য কবিতার অংশ। একদিকে প্রতিবাদী ও অন্যদিকে নতুন প্রবর্তনায় উত্তীর্ণ এ কবিতা এখনো বাংলা কাব্যের সৃজনশীল ঐতিহ্যের নবতম নির্ধারক।

১৪৫ কবিতা ১৪৪ দেখুন। মেথর বাংলার তফশীলভুক্ত জাতিদের একটি। ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর এঁদের বেশির ভাগের আবাসস্থল। এঁদের এখনো অস্পৃশ্য অশুচি ভাবেন অনেকেই।

১৪৬ জি. এফ. ওয়াটসের একটি ছবি এই কবিতার প্রেরণা হয়েছিল। কবিতা ৩৩ ও তার টীকায় ছবি ও কবিতার এই সহযোগের অন্য দৃষ্টান্ত দেখুন। অরফিউস ও ইউরিদিসের থিম রিলকের কাব্যের প্রেরণা হয়েছিল। বেহুলা স্বর্গে গিয়ে নাচ দেখিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে মৃত পতিকে উদ্ধার ক'রে এনেছিলেন—এদিক থেকে এ দুটি পুরাণকাহিনীর ঐক্য আছে।

১৪৭ পার্থক্যের জন্য কবিতা ৯২ দেখুন। রোমান্টিক ব্যালাডের প্রভাব এই রচনায় সক্রিয়। তবু এ আন্তরিকতা মিথ্যা নয়।

১৪৮ কবিতা ১২৮ এ গোপীযন্ত্রের ব্যবহার দেখুন। বাদ্যযন্ত্রটির নামে ধর্মীয় অনুষঙ্গ আছে, কিন্তু লোকায়ত ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষেত্রেও যন্ত্রটি এখনো জনপ্রিয়। যিনি গোপীযন্ত্রের ধারক, তিনি একই সঙ্গে গান, বাজান ও নাচ করেন।

১৫১ ভিক্টোরিয় যুগ নিজের প্রয়োজনে ফিটজেরাল্ডকে দিয়ে ওমর খৈয়ামের রুবাই অনুবাদ করিয়ে নিয়েছিল। বাংলায় কান্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাই অনুবাদ ঐ যুগ-প্রয়োজনকেই ভাষা দিয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, মনন ও আবেগ, আলস্য ও তত্ত্বপ্রবণতা, অক্ষরবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের দ্বন্দ্ব ও সন্নিকর্ষের যে নকশায় আধুনিক বাংলা কবিতা বোনা, তার উপরেই কান্তিচন্দ্রের কারুকার্য। কালিদাসের মেঘদূতের মতো ওমরের রুবাই এখনো বাঙালি বিয়ের অভিজাত উপহার হিশেবে আদৃত হয়।

১৫২ বাংলা রোমান্টিক কবিতাকে একটি বিশিষ্ট পরিণতির খাতে বইয়ে নিয়ে গেছেন সুকুমার। যা অর্থবহ তা সেখানে উদ্ভট, যা অধি-বাস্তব তাকে মাথার ওপর দাঁড় করালে এখানে তা বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়।

১৫৩ রচনারীতি বৈষ্ণবপদাবলীর, কিন্তু রচনা চিরকৈশোর নিয়ে নয়। পদাবলীর ঐতিহ্য ভেঙে কবি নতুন কিছু নির্মাণ করেছেন। অনুরূপ প্রসঙ্গ নিয়ে রঁসার সনেট আছে। প্রাচ্যের সমাজ ও সাহিত্যে বার্ধক্য সুন্দর, পশ্চিমে ততটা নয়। কবিতা ১১৬র সঙ্গে পার্থক্য দেখুন।

১৫৪ ফেমিন রিলিফ দেওয়ার নির্দেশ ছিল ভারতীয় অর্থশাস্ত্রে, এখনও আছে। গ্রামবৃদ্ধরা দুর্ভিক্ষের ও মন্বন্তরের বছর ধ'রে এখনো বয়স গণনা করেন। দুর্ভিক্ষ শুধু দাসশ্রেণী সৃষ্টি করে না, প্রতিবাদেরও জমি তৈরি করে। বৃটিশরাজের শেষের দিকে বাংলায় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, সেই ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার বহনের পালা এখনো চলছে।

১৫৫ উনিশ শতকি বাংলা কবিতার নারীবন্দনা নারীকে ক্রমে স্থূলতা থেকে সূক্ষ্মতার লোকে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে চেয়েছিল। মোহিতলালের নারীস্তোত্র এসেছে সেই ধারা বেয়ে। পৃথিবীর আদিমতম ব্যবসায়টিকে ভাবাবেগ দিয়ে শোধন করার করুণ কিন্তু আন্তরিক প্রয়াস চোখে পড়ে এই অংশে। এবং সময়ের পরিহাস এই যে বিমূর্তায়নের চেষ্টা সত্ত্বেও নারী শরীর বড়ো বেশি মূর্ত, সেদিনকার কালীঘাটের পটের ভারালস মহিলাদের মতোই।

১৫৭ 'বিদ্রোহী' কবিতার এই এক স্তবক থেকে এর তীব্র সংবেগের কিছুটা আঁচ করা চলে। দেশি, আরবিফারসি ও সংস্কৃত শব্দ, হিন্দু ও ইসলামি পুরাণ, শক্তি ও স্নিগ্ধতাকে কবিতার এক বিরাট কড়াইয়ে ঢেলে নজরুল সতেজে পাক করেছেন, তাঁর রসবস্তু হুইটম্যান আর মায়াকভস্কির মতো বিমিশ্র, বাষ্পাকুল, উচ্ছ্বসিতভাবে ফেনিল এবং টগবগে।

১৫৮ শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংহতির বিখ্যাত গান ইনটারন্যাশনাল-এর নজরুলকৃত তর্জমার অংশ। নজরুলের এ অঙ্গীকার তাঁর কাব্যজীবনের কোনো বিচ্ছিন্ন দায় নয়। উনিশশো সাতাশের 'গণবাণী' পত্রিকার মে-দিবস সংখ্যায় এ অনুবাদের সঙ্গে তাই প্রকাশ পেয়েছিল নজরুলের নিজের লেখা 'রক্তপতাকার গান' এবং নজরুলের করা শেলির 'শ্রমজীবী' কবিতার ভাবানুবাদ।

১৫৯ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা আজও এদেশে মিথ্যা পরিহাসের মতো শোনায়। কবিতা ৫৬ দেখুন।

১৬০ য়েটসের মতো স্বদেশের পুরাণ ইতিহাস রাজনীতির ভিতর, চলে গিয়ে জীবনানন্দ তাঁর স্বপ্নের সত্য বাংলাদেশ আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধধ্বস্ত পৃথিবীর জটিল নাগবিক বিচ্ছিন্নতার বোধ এ কবিতামালার পিছনে দীর্ঘ নস্টালজিক ছায়া ফেলেছে—বাংলা নামে দেশ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছায়া সেখানে একাকার। তবু জীবনানন্দ জানতেন, বাংলার জীবনে সংকট শেষ হয়ে গিয়েছে ব'লে যে মনে হয় সে শুধুই মনে হওয়া মাত্র।

১৬১ যে কটি অঙ্গুলিমেয় বাংলা কবিতায় কালচেতনা ও ইতিহাসচেতনা এসে মিলেছে 'পৃথিবীলোক' তাবই একটি।

১৬২ কবিতা ১ দেখুন।

১৬৪ একটি প্রকৃত আন্তর্জাতিক বোধের কবিতা। কংগো বা গঙ্গানদীর ধারে এ অনুভবেব সমান সত্যতা। মিল ও অমিলের জন্য কবিতা ১৫০ ও ১৫৬ দেখুন।

১৬৫ কবিতা ১৪৮ দেখুন। শ্রম কাব্যমূল্য পেয়েছে, সৃষ্টিকর্ম সামাজিকতার শর্তে সম্মানিত, তবু সৃজনশীল বাস্তবতার ক্ষেত্রে শিল্পীব স্বাধীনতাও সমান স্বীকৃতি পায়। সমসময়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক শিল্পী তাঁতির গল্প লেখেন যে লোভের দাদন না নিয়ে বিনি সুতোয় সাবাবাত তাঁত চালায়।

১৬৬ মিল/অমিলেব জন্য কবিতা ১৪৯ দেখুন।

১৬৮ শ্রম কবিতামূল্য পেয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনের বীরত্বটুকুও স্বীকৃত। বাংলা সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যবচনার ক্ষেত্রে এ সামান্য কিন্তু তাৎপর্যে বিরাট একটি পদক্ষেপ। এসব কাজে বিচুআলের মর্যাদা আছে, প্রসঙ্গটিকে তাই কখনো আবোপিত মনে হয় না। কবিতা ১৬৭ দেখুন।

১৬৯ উর্বরতা/উষরতার প্রসঙ্গটি নিসর্গপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে গেছে, মিশে গেছে বিয়ের গান আর বৃষ্টি-নামানোর আচার অনুষ্ঠান। নৃতত্ত্ববিদ্ খরাক্লিষ্ট এদেশে ব'সে এই গান শুনতে পান, আর ফ্রেজার শাহেবের কাছে যেতে হয় না। কবিতা ৪৭ দেখুন।

১৭১ বাঙালি মেয়েদের বিয়ের সমস্যা মধ্যযুগের চেয়ে এখন কোনোমতেই কম

সঙ্কুল নয়। ধার্য পণ না দিতে পারায় স্বামিগৃহে নববধূ লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করছেন, এ এখনো আমাদের সংবাদপত্রের নিত্যনৈমিত্তিক সংবাদ। কবিতা ৫৮ দেখুন।

১৭৪ সৃজনশীল ঐতিহ্য যেমন পুরাণের নতুন প্রয়োগ ঘটিয়ে বাস্তবকে নির্মাণ করে, তেমনি প্রত্ন আচারকেও নতুন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেয়। মহাভারতের সংস্তব নয় শুধু, এ আজকের ভাবতেরও বৃন্দগানের বিষয়। কবিতা ১৬৯ দেখুন।

১৭৬ পুরাণকে আধুনিকে ভেঙে নির্মাণের কাজ থেকে যায় প্রত্যেক সৎ দায়িত্বশীল কবির। জন্মদিনের আরেকটি মিথের ব্যবহারের জন্য কবিতা ১৭৫ দেখুন।

১৭৮ বিশ্বযুদ্ধের পটে সমস্যাজটিল নাগরিক মন রাবীন্দ্রিক মানবিক বিশ্বাসকে আরো বেশি আঁকড়ে ধরতে চায়। বাংলা কবিতার আধুনিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বস্তুত কোনো বিরোধ নেই। কবিতাটি দীর্ঘ কিন্তু নানা জায়গায় আবৃত্তির ফলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

১৮০ কবিতা ৬৩ দেখুন। বন্যায় সেখানে মন্ত্রীও ভেসে যান।

১৮১ কবিতা ১১৬ দেখুন।

১৮২ বাংলাদেশ সাপের দেশ এবং বিদেশিদের কাছে সাপুড়েদেরও দেশ।

১৮৫ কবিতা ১৮২র সঙ্গে সুর ও স্বরের পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

১৮৬ কবিতা ৬১ দেখুন।

১৯৩ কবিতা ৭৫ দেখুন।

১৯৪ কবিতা ৯৯ দেখুন।

১৯৫ সাঁওতালরা বাংলার নৃতাত্ত্বিক বনিয়াদের একটি বিরাট বড়ো অংশ তৈরি করেছেন। এঁরা মূলত রাঢ় অঞ্চলের উপজাতি। হিন্দুদের অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, চাবাগানের ডাকে এঁরা ছড়িয়ে পড়েন। আজও এঁরা ভাসমান শ্রমিকমণ্ডলী তৈরি করে চলেছেন। কিন্তু এই আদি অস্ত্রাল গোষ্ঠীভুক্ত প্রাক্-দ্রাবিড় মানুষগুলি যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে আদিম শিকড় নামিয়ে দিয়েছিলেন একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বাংলা ছড়ার ছন্দ আর সাঁওতালি গানের ছন্দ প্রায় মিলে যায়।

১৯৭ টেরাকোটা শব্দটি মধ্যশ্রেণীর মানুষদের মূল্যায়নের স্বতোবিরোধ ও শৌখিনতা ধরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। লোকসাহিত্য ও লোকশিল্প

সম্পর্কে আধুনিক বাঙালির বাড়তি মনোযোগ একধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিলাস মাত্র।

২০১ বাংলা আজ বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা। এ স্মৃতিস্তম্ভ বাংলাভাষা নিয়ে রক্তাক্ত আন্দোলনের মধ্যে উঠেছে।

২০৫ ব্রেশটের থ্রি-পেনি অপেরার একটি গানেব অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে প্রকাশিত।

কবিতা : তুলনামূলক সময়-সারণী

বাংলা	বিশ্ব
প্রাচীন পর্ব	
১০-১২ শতক	
চর্যাগান	তমিল কবি কম্বরের রামায়ণ/কাশ্মীরের লল্লা দেবীর শৈবগাথা/ফিরদৌসির শাহনামা/রুশ ইগরগাথা/আইসল্যাণ্ডের এলডার এড্ডা/ফরাসি কানজোন দ্য রোলাঁ।
মধ্যপর্ব	
১৩-১৮ শতক	
জয়দেব বিদ্যাপতি কৃত্তিবাস কবিকঙ্কণমুকুন্দ চণ্ডীদাস আলাওল ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ পূর্ববঙ্গগীতিকা	শ্রীধরদাস সম্পাদিত সদুক্তিকর্ণামৃত/জ্ঞানেশ্বরের গীতার মারাঠি ভাষ্য/জর্মান নিবেলুনগেনলিয়েড / ইতালিতে দান্তের লা দিভিনা কোমেদিআ/বোকাচ্চিওর ডেকামেরন/ইংলণ্ডে রাজা আর্থারের বৃত্তান্ত/ল্যাংলণ্ড/চসারের ক্যাণ্টরবেরির গল্প/ক্যাক্সটনের মুদ্রাযন্ত্র/ফরাসি কবি ভিয়োঁ/হিন্দিতে সুরদাস কবিরের দোহা/তুলসীদাসের রামচরিতমানস/গুজরাতি মীরার ভজন/শেকসপিঅরের নাটক/ভাস্কো দা গামার জলপথে ভারতযাত্রা নিয়ে পোর্তুগিজ মহাকাব্য/স্পেনসরের ফেআরি কুইন/মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট/ফিনল্যাণ্ডের কালেভালা।

আধুনিক পর্ব

১৯-২০ শতক

মধুসূদন
ববীন্দ্রনাথ
নজরুল
জীবনানন্দ

গ্যেটেব ফাউস্ট/বোমান্টিক ইংবেজ কবিবা/গালিবেব উর্দু গজল/বোদলে-আবেব ও হুগোব ফবাসি কবিতা/রুশ কবি পুশকিন/জর্মান কবি হাইনে, বিলকে/উর্দুতে ইকবালেব কবিতা/মার্কিন কবি হুইটম্যান/হিস্পানি কবি লোবকা/ইংবেজ কবি এলিঅট ও যেট্স/হিস্পানি কবি হিমেনেথ ও পাবলো নেরুদা।

'হাজার বছর' কথাটির অভিধায় যে সুদীর্ঘ কালপ্রবাহের ভাবনা আছে সেই ভাবনা জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি স্বতন্ত্র ছত্রে প্রকাশিত হয়েছে। "বনলতা সেন" কবিতার প্রথম ছত্রে কবি বলছেন :

হাজার বছর ধরে' আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।

"পথ হাঁটা" কবিতাটির সর্বশেষ ছত্রে বলছেন :

আজও আমি জানিনেকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

এর পরে "হাজার বছর শুধু খেলা করে"-শীর্ষক কবিতায় বলছেন :

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো

'হাজার' শব্দটির অভিধা এই তিনটি ছত্রের কোনটিতেই গাণিতিক অর্থে সসীম নয়, বরং শব্দটির ব্যঞ্জনাই কবিচিত্ত থেকে উৎসারিত হয়ে পাঠক চিত্তে প্রবেশ করে। 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'—এই শিরোনামে সেই প্রতীকী ব্যঞ্জনা ক্রিয়াশীল হয়েছে। ব্রতের গান, খনার বচন, চর্য্যা গান,—এ সমস্ত কবিকর্মের কোনোটিতেই শতক-দশক-একক হিসাবে কোনো বিশেষ তারিখের ছাপ লাগানো নেই যেমন নেই বেদ এবং উপনিষদগুলিতে, হোমর বা এইস্‌কিলাসের রচনাতে, বেওউল্‌ফ্‌ অথবা ঈগর গাথায়। কিন্তু 'হাজার' কথাটির ব্যঞ্জনায় আছে বিস্তৃতি, প্রসার, ব্যাপ্তির চেতনা, একটা প্রতীকী যুগচেতনা। সেই ব্যঞ্জনা ও চেতনা আমাদের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সূচিত হয়েছে যেমন প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্যে 'মিলেনিয়াম' শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে ধূসর অতীত। বিদেশী প্রাচীন-কাব্যের কথা যখন স্মরণ করি প্রাচীন বাংলা কাব্যের আলোচনায়, তখন একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকা একান্ত প্রয়োজন। বৈশিষ্ট্যটি (আমার সংবেদনায়) এই রকম : অন্য কোনো কোনো সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলিতে ভাষা প্রয়োগ আধুনিক সাহিত্যের প্রয়োগের তুলনায় দুর্বোধ্য, আবছায়া, যেন কোনো বিদেশী ভাষার রচনা। প্রাচীন ইংরেজি ভাষায় রচিত 'উইড্‌সিথ্‌', 'বেওউল্‌ফ্‌' প্রভৃতি কাব্য মধ্যযুগের ইংরেজি কবিতার তুলনায় দুর্বোধ্য, যেন কোনো অন্য ভাষায় রচিত বস্তু। অথচ আমাদের বাংলা কাব্যে যে রচিত হয়েছিল চর্য্যাগান, সে-কাব্যের ভাষা আজকের পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ বোধাতীত নয়, আজও 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' গোছের ছত্র অল্প বা বিনা আয়াসেই আমাদের বোধের আওতায় আসে।

অতএব এমন কথা অসঙ্কোচেই বলা যায় যে যদিও বাংলা ভাষায় রচিত কবিতার আদিমতম অনেক নিদর্শনই আজ মিলিয়ে গেছে ইতিহাসের কুয়াশায়, তবুও অন্য বহু ভাষার তুলনায় বাংলা কাব্যের ছেদহীন প্রবাহ চলেছে সাংস্কৃতিক

ইতিহাসের হাজার বছর ধরেই। মিলিয়ে গেছে অনেক কবিতাই তবুও যে-পরিমাণ কবিতা আজো আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আছে (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশ সেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, প্রমুখ সাধক-পণ্ডিতের মননশীল পরিশ্রমের ফলে) সে-কবিতাগুলিতে এমন কিছু আবেগ এবং সামাজিক-দার্শনিক চিন্তা লক্ষ্য করতে পারি যা' বাংলা ভাষার আধুনিক জীবন থেকে অত্যন্ত দূরে নয়। আমরা বলতে পারি বাংলা কাব্যে বাঙালীর অন্তর্জীবনই মুকুরিত হয়েছে। বস্তুত শিল্প তো শিল্পস্রষ্টার জীবনবোধ থেকেই উৎসারিত। জীবনবোধ যদি যুগে যুগে বদলায়, তাহলে সেই সঙ্গে শিল্পবোধও বদলায়। বদলায়, কিন্তু সে-বদল নিগূঢ় জাতিচেতনার বদল নয়, সে-বদল হচ্ছে বহিরঙ্গ চেতনার। যে কাব্য-সঙ্কলনটির নির্ভরে আমরা এই সাহিত্যচিন্তায় লিপ্ত হয়েছি, সে-সঙ্কলনে গোপাল-বিজয়ের কয়েকটি ছত্রে মধ্যযুগের শ্রেণী-ধর্মঘট দেখতে পেয়েছেন সঙ্কলক, এবং সেই দেখার সঙ্গে স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' কবিতাটি। এই স্মরণ, এই তুল্যতাবোধ থেকে প্রমাণ হয় যে হাজার বছরের বাংলা কবিতায় বয়ে' চলেছে বাঙালী জাতির অপরিবর্ত্তিত চেতনাপ্রবাহ। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত ম্যালিনৌস্‌কির চিন্তায় বিধৃত হয়েছিল এই প্রত্যয় যে শিল্প হচ্ছে জাতিচেতনাব রূপস্হজনী প্রকাশ।

হাজার বছরের বাংলা কবিতাতে এ হেন রূপস্হজনী প্রকাশ লক্ষ্য করবেন যে কুশলী পাঠক, তাঁর কাব্যপাঠই সার্থক, তাঁর কাব্যপাঠেই বাংলা কাব্যের অন্তর্গূঢ় শক্তি প্রতিভাত হয়, সে-শক্তির বোধ বিকৃত হয় না যুগের সঙ্গে যুগেব ভেদাভেদ জ্ঞান দ্বারা। কোনো কোনো অন্যদেশীয় ভাষার কাব্যে লক্ষ্য কবি (যেমন ইংরেজি, ফরাসী, ইতালীয়) যে প্রাচীন কবিকর্মের সঙ্গে আধুনিক কবিকর্মের ভাবচেতনায় তুল্যতা নেই। ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে আন্দ্রিয়াস্ বা ব্যাট্‌ল্ অব্ ম্যাল্‌ডন গোছের কবিতায় যে-চেতনা নিহিত দেখতে পাই, তেমন কোনো সমগোত্রীয় চেতনা দেখতে পাই না আধুনিক কালের ইংরেজী কবিতায়। দেখতে পাই না প্রধানত এই কারণে যে আধুনিক ইংরেজির ভাষা, ধ্বনি, তাৎপর্য প্রায় আমূল পরিবর্তিত্ হয়ে গেছে। অপর পক্ষে, বাংলার প্রাচীন কাব্য আধুনিক পাঠকের কাছে অবোধ্য নয়, যদিও সর্বক্ষেত্রে সমান সহজবোধ্য না-ও হতে পারে।

অপুব্ব বসন্ত ভুকেল্লা শবরো অম্বর ফলই ফুল্লই। কয়েক শতাব্দী পূর্বে রচিত এই ছত্র আধুনিক সংবেদনশীল পাঠকের বিবেচনায় অবোধ্য না হওয়াই সম্ভব। কয়েক শতাব্দী পূর্বে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী আজো বাঙালী পাঠক জগতে এবং সঙ্গীত সমাজে সর্বরকমেই গ্রাহ্য।

বাংলা কাব্যের অবঙ্কিম প্রবহমানতার মূল কারণ ভাষা-সম্পর্কিত। যেখানে দেখি যে ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসে ওল্‌ড্ ইংলিশ থেকে মিড্‌ল্ ইংলিশে পৌঁছই যেন কোনো নূতন ভাষার রাজ্যে, তারপরে মিড্‌ল্ ইংলিশ (চসার,

গাওয়ার) থেকে রেনেসাঁস ইংলিশে পৌছিয়ে তেমনই কোনো নূতন ভাষার রাজ্যে উপস্থিত হই, আবার রেনেসাঁসী ইংরেজি থেকে বিশ শতকী ইংরেজিতে পাই প্রবল পার্থক্য। ভাষার, শৈলীর পার্থক্য। এই পার্থক্য গভীরতর হয়েছে নাগরিক ভাষাপ্রয়োগ এবং গ্রাম্য ভাষাপ্রয়োগের তারতম্যে। ইংরেজি ভাষার কিছু প্রাদেশিক প্রয়োগে (ইয়র্কশায়ারের প্রয়োগে, স্কটিশ বচনের প্রয়োগে, ওয়েল্‌স্‌ ও আইরিশ ভাষার প্রয়োগে) যে প্রবল প্রভেদ, বাংলা ভাষার স্থানীয় রূপগুলিতে তেমন প্রবল প্রভেদ নেই। এই ভাষাভিত্তিক তুল্যতার মূলে আছে জাতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গির সমতা, পরিবেশ-জীবনের কিছু মৌল সমতা। কয়েকটি উপন্যাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি "পদ্মানদীর মাঝি", "তিতাস একটি নদীর নাম", "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা" তুলনীয় আঞ্চলিক ভাষার স্বাদ দেয় পাঠককে।

এই ভাষাগত সহজবোধ্যতার সঙ্গে মিশেছে বাঙালী জাতির চিন্তার, দৃষ্টি-ভঙ্গির সমতা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনৈক বিদেশী বিদগ্ধ পাঠক (দ্যুসান্‌ জ্‌ব্যাভিদেল) একটি মন্তব্য করেছেন :

Limited appears to be the thematic inventory of older Bengali poetry. Again and again the same themes are elaborated and the same stories re-narrated.

কথাটা সত্য, কিন্তু শ্রী দ্যুসান্‌ যদি চিন্তা করে দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন যে পুনরাবৃত্ত ভাবের ও কাহিনীর ধারা যাবতীয় প্রাচীন সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য। সব সাহিত্যেই একই সৃষ্টি-কাহিনী, একই লোকগাথা, একই ভাবাবেগ ফিরে ফিরে আসে। আসবেই, কেননা জনপদ-সংস্কৃতি তো এ হেন ভাবের ও তত্ত্বের সম্মিতির উপরে নির্ভরশীল। রামায়ণ-কথা পুনরাবৃত্ত হয়েছে আমাদের দেশে। ঈগর-গাথা পুনরাবৃত্ত হয়েছে মধ্য-রুশিয়ায়। আধুনিক কালের সাংস্কৃতিক জটিলতার এবং বহুধা-বিভাগের ফলে সাহিত্যের ও শিল্পের বিষয় হয়েছে বহুসংখ্যক এবং সেই সঙ্গে হয়েছে প্রখরভাবে ব্যক্তিমানসের প্রকাশ, কিন্তু ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন্‌ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব প্রধান ভাষায় ও সাহিত্যে (তথা বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে) কতকগুলি সর্বজনমান্য ভাববস্তু প্রচলিত ছিল।

হাজার বছরের বাঙলা কাব্য পড়ার সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে বাঙালী সংস্কৃতির এবং বাঙলা কাব্যের সমান্তরাল দিকবাহী ধারার কথা।

হাজার বছরের বাংলা কাব্য পড়ার সময় কাব্যের আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা সচেতন হতে পারি। একটি বৈশিষ্ট্যে লক্ষ্য করি বাক্‌রীতি, ছন্দ, মিল, কবিতা-স্তবকের গঠন শতাব্দীর পরে শতাব্দী একই সরল প্রবাহে বয়ে' চলেছে : যুগ্মছত্রে মিল-বাঁধা পয়ারের প্রবাহ। এই পয়ারে যেমন বিধৃত হয় বর্ণনা—জীবনের গতিশীল রূপ ও নিশ্চল রূপ দুই-ই, জীবনের স্থূল রূপ এবং সূক্ষ্ম মনোময় রূপ দুই-ই—তেমনই বিধৃত হয় কথোপকথন, যুক্তি, তত্ত্ব,

আবেগ। উনিশ শতক থেকে বাঙলা কাব্যে এসে পড়ল (ইংরেজি কাব্যের অনুসরণে) রকমারি স্তবক। আগে যেখানে পয়ার ছেড়ে ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী প্রভৃতি প্রভিন্ন ছন্দোবন্ধন প্রযুক্ত হত, এখন সেখান থেকে বাঙলা কবিতা এগোল অনেক দিকে। বিদেশী কাব্যের অনুসরণে মাইকেল প্রবর্তন করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সে-প্রবর্তনের ফলে বিচিত্র নতুন সুর প্রবেশ করল বাঙলা কাব্যে এবং মাইকেল-পরবর্তী কবিগণ অজস্র নবরূপ সজ্জায় শোভিত করলেন বাঙলা কাব্যকে। কাব্যস্তবকের আকারে ও ধ্বনি প্রবাহে এলো নতুনত্ব। গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি দ্বিতীয় সারির কবিদের রচনায়ও স্তবকের বৈচিত্র্য প্রবেশ করল, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় **verse-form, verse-pattern, verse-structure,** সেই স্তবক গঠনের রকমারি রূপ (অতএব কাব্যের সুর-বৈচিত্র্য) প্রবেশ করল বাংলা কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের হাতে এই রূপ পেলো এক অনিঃশেষ বিস্তার। আমাদের বাঙালী কবিগণ উনিশ শতকী ইওরোপীয় কবিদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, শেলি-কীট্স্-উগো-হাইনে-মালার্মে প্রভৃতি স্বাতন্ত্র্য-পন্থী কবিদের শিল্পকৃতিকে রূপায়িত করলেন নিজ ভাষার, ধ্বনির, ব্যঞ্জনার পরিপ্রেক্ষিতে। রবীন্দ্রনাথের বহু স্তবকে (যেমন 'উর্ব্বশী', 'তপোভঙ্গ', 'আহ্বান', 'লীলাসঙ্গিনী'—অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র দু' চারিটির উল্লেখ করলাম), রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন জনকয়েক ও তাঁর পরবর্তী বহু কবির রচনায়, কাব্য স্তবকের কত যে অবয়বী রূপ প্রকাশিত হল, **structural** বা **formal** বহিরঙ্গের বৈচিত্র্য প্রকাশিত হল তার একটি পরিচ্ছন্ন স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়া উচিত আমাদের বাঙলা কাব্যের আলোচনায়। আমার সেই আদর্শ আলোচনায় বিধৃত থাকবেন এই কাব্যসংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হননি এমন আরো অনেক কবি, যথা: দাশরথি রায়, গগন হরকরা, মদন বাউল, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কামিনী রায়, প্রথম চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, জগদীশ ভট্টাচার্য, অশোকবিজয় রাহা, অরুণ ভট্টাচার্য, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সুশীল রায়, শামসুর রহমান।

হাজার বছরের বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে দৃষ্টি প্রসারিত করলে আরো যে অনেক বৈচিত্র্যের কথা মনে আসে তার একটি অবশ্যই কাব্যছন্দের দ্রুত অগ্রগমন, যে-অগ্রগমনের প্রেরণা এসেছিল পাশ্চাত্য কাব্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের ফলে। মাইকেল আমদানি করেছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করলেন হুইট্‌ম্যান ধরনের অসম ছন্দ। রবীন্দ্রনাথই সৃজনী রূপ ও মর্য্যাদা দিলেন গদ্যছন্দকে।

হাজার বছরে বাঙলা কবিতার অগ্রগতি—যেমন বহিরঙ্গে তেমনি অন্তশ্চেতনার নব নব রূপসন্ধানে—ঐশ্বর্যময় ও বিচিত্র। সে-বৈচিত্র্যের মাত্র দুয়েকটির আভাস দেওয়া হল এই প্রবন্ধিকায়।

অমলেন্দু বসু